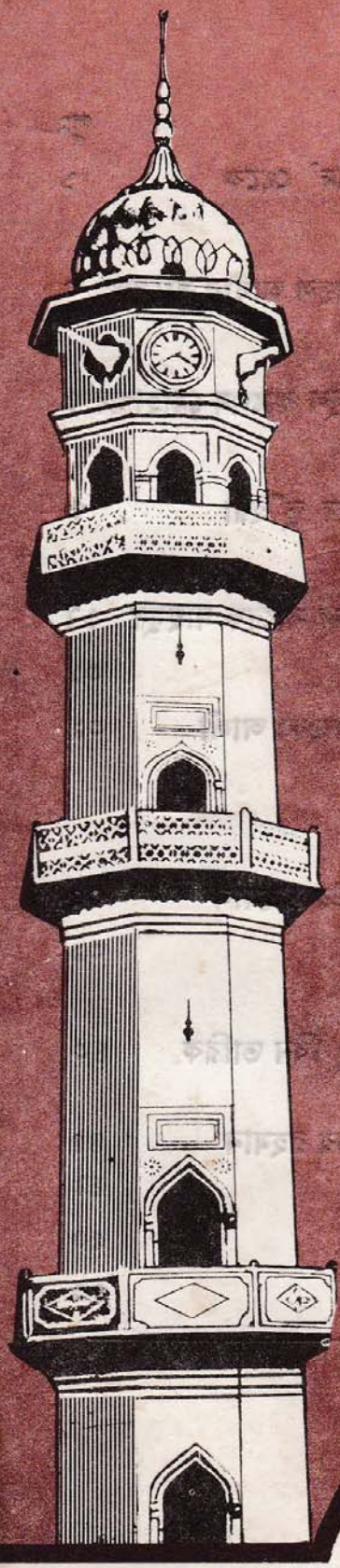

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৮ বর্ষ ॥ ২০তম সংখ্যা

২১শে যিলহজ্জ, ১৪১৭ হিঃ ॥ ১৭ই বৈশাখ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ		অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	৩
অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	:	অনুবাদ : মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ	৫
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	:	অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৬
জুমুআর খুৎবা	:	অনুবাদ :	
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)		মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
ন্যাশনাল আমীরের দপ্তর থেকে :			৩১
চলতি দুনিয়ার হালচাল : ধর্মীয় পুণ্যকে পণ্যে পরিণত	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৩২
আহমদীয়া তবলিগী পকেট বুক মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ	:	ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৫
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		৩৯
এম, টি, এ ডাইজেস্ট	:	সংকলন : আবদুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক	৪৩
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৪৫
সংবাদ	:		৪৯
আস্হাবে কাহাফের পাতা	:	আররকীম	৫০
সম্পাদকীয়	:		৫৩

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতারম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৮তম বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

৩০শে এপ্রিল, ১৯৯৭ : ৩০শে শাহাদত, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ১৭ই বৈশাখ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্ নিসা—৪

৮৩। তবে কি তাহারা কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে না? এবং যদি ইহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা উহার মধ্যে বহু গরমিল (৬৩৯) পাইত।

৮৪। এবং যখন তাহাদের নিকট নিরাপত্তার অথবা ভয়-ভীতির কোন কোন সংবাদ আসে তখন তাহারা ইহাকে খুব প্রচার করিয়া বেড়ায়, (৬৪০) তখন যদি তাহারা উহা রসূলের প্রতি এবং তাহাদের মধ্যে কর্তৃপক্ষের প্রতি সমর্পণ করিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারে তাহারা অবশ্যই ইহা জানিয়া

৬৩৯। 'গরমিল' দুই তিন প্রকারের হইতে পারে: (ক) এক কথার সাথে অন্য কথার বিরোধিতা, (খ) একটি শিক্ষা অপর একটি শিক্ষার বিপরীত, (গ) ভবিষ্যদ্বাণী এক রকম কিন্তু ফল হইয়াছে অন্য রকম অর্থাৎ ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার ফলাফল পরস্পর বিপরীতমুখী হইয়াছে।

৬৪০। এখানে শান্তি-বিষয়ক শুভ সংবাদের কথা প্রথমে বলিয়া পরে ভীতি-বিষয়ক সংবাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, কুরআন এখানে যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে, কোন কোন অবস্থায় শান্তি-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আনন্দসূচক সংবাদাদি ছড়ানোও যুদ্ধ-ভীতির সংবাদাদি ছড়ানো হইতে অধিকতর বিপজ্জনক হয়। সাধারণ অবস্থায়ও কোন সংবাদ শুনিয়াই, তাহা প্রচার করিতে থাকা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। কেননা, সংবাদটি গুজবও হইতে পারে এবং শত্রুর উদ্দেশ্যমূলক কারসাজিও হইতে পারে। 'উলীল আম্‌র' (আদেশ দেওয়ার অধিকারী কর্তৃপক্ষ) বলিতে মহানবী (সাঃ)-কে কিংবা তাঁহার খলীফাবৃন্দ কিংবা তাঁহাদের নিয়োজিত আমীরগণকে বুঝাইয়া থাকে।

লইত। আর যদি আল্লাহ্‌র ফযল এবং তাঁহার রহমত তোমাদের উপর না হইত, তাহা হইলে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলেই শয়তানের অনুসরণ করিতে।

৮৫। অতএব, তুমি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে তোমার নিজের জন্য (৬৪১) ছাড়া দায়ী করা হয় নাই—এবং তুমি মো'মেনদিগকে (যুদ্ধের জন্য) উৎসাহিত করিতে থাক। হয় তো অচিরেই আল্লাহ্ তাহাদের যুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়া দিবেন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ শক্তিতে অতীব কঠোর এবং শাস্তি দানেও অতীব কঠোর।

৮৬। যে কেহ সৎ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহা হইতে একাংশ থাকিবে, এবং যে কেহ মন্দ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহার তুল্য অংশ (৬৪২) থাকিবে, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৮৭। এবং যখন তোমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানাইও, অথবা (কমপক্ষে) উহাই প্রত্যার্পণ করিও (৬৪৩), নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

৬৪১। 'যুদ্ধ কর' এই আদেশটি কেবল নবী করীম (সাঃ)-এর উপর ব্যক্তিগতভাবে প্রযোজ্য নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে পরবর্তী বাক্যাংশটি হইতে 'ইল্লা নাফ্‌সুকা' তুমি ছাড়া আর কেহ দায়ী নয়। কিন্তু পরবর্তী বাক্যটি আসিয়াছে 'ইল্লা নাফ্‌সাকা (তোমাকে তোমার নিজের জন্য ছাড়া দায়ী করা হয় নাই)। প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াত ইহাই বলিতেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, এমন কি নবী করীম (সাঃ)ও ব্যক্তিগতভাবে, আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী। তবে মহানবী (সাঃ)-এর এই বিষয়ে দায়িত্ব দুইটি—একটি দায়িত্ব নিজে যুদ্ধ করা, অপর দায়িত্বটি তাঁহার অনুসারীদিগকে যুদ্ধে শরীক করানো। যদিও তিনি তাহাদের জন্য দায়ী নহেন।

৬৪২। এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, সুপারিশ করার কাজটি হালকা মনে করা ঠিক নয়। যে ব্যক্তি অন্যের জন্য সুপারিশ করে, সুপারিশকারী ব্যক্তি নিজে তাহার সুপারিশের ন্যায্যতার জন্য দায়ী হইবে। তাহার সুপারিশ যদি সঠিক ও ন্যায়ভিত্তিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে পুরস্কৃত হইবে। অন্যথায় তাহার সুপারিশের খারাপ ফলাফলের জন্য সে দায়ী হইবে। এ কথাটা এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, 'সৎ কাজের' সুপারিশের ক্ষেত্রে 'নসীব' (অংশ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং 'অন্যায় সুপারিশের' ফলশ্রুতি 'কিফ্‌ল' (সম-পরিমাণ অংশ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝানো হইয়াছে যে, মন্দ-সুপারিশের শাস্তি সম-পরিমাণের হইবে, কিন্তু উত্তম সুপারিশের পুরস্কার হইবে অনেক বেশী, যাহা আল্লাহ্‌তা'লা ন্যূনতম পরিমাণ দশগুণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

৬৪৩। ইহা সামাজিক কর্তব্যের বিশেষ অঙ্গ, ইহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه -

(مسلم : كتاب الايمان)

হযরত উমর (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি নিজ ভাইকে বলে, ওহে কাফের! তখন তাদের উভয়ের মধ্য হতে কেউ না কেউ অবশ্যই কুফরীর অংশীদার হয়ে যায় অর্থাৎ যদি সেই ব্যক্তি যেরূপ বলেছে সেরূপই হয় তাহলে তো হলো, কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে সেই কুফরী তার উপরেই বর্তাবে (মুসলিম : কিতাবুল ঈমান)।

উক্ত হাদসীসটি ছোটখাট হলেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ছিলেন রহমাতুল্লিল আলামীন—নর-নারী, স্বাধীন-পরাধীন, রাজা, প্রজা তথা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য, পশু পাখীর জন্য, জড়পদার্থের জন্য, এমনকি পৃথিবীর বাইরে অপরাপর জগৎসমূহের জন্যও হুযূর (সাঃ) ছিলেন রহমত ও কল্যাণস্বরূপ। মানুষের অন্তর্জগতেও এবং বহির্জগতেও নিরাপত্তা ও শান্তি স্থাপন করাই ছিল হুযূর (সাঃ)-এর সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তু। তাই তাঁর আনীত ধর্মের নামকরণ করা হলো ইসলাম—শান্তি আর শান্তি। তিনি (সাঃ) শান্তি স্থাপন করেছেন দেখা সাক্ষাতের সময় (السلام عليكم), শান্তি স্থাপন করেছেন নামাযের মধ্যে (السلام علينا) শান্তির বাণী পেশ করেছেন নামায শেষ করে আল্লাহ্র দরবার হতে ফিরে দুনিয়াবাসীর সম্মুখে ডান দিকে মোমেন ভাইদিগকেও এবং বাম দিকে কাফের ভাইদিগকেও; অতঃপর আবৃত্তি করতে থাকলেন اللهم انت السلام و منك السلام অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি শান্তির উৎস, তোমা হতে শান্তি মুহুর্মুহুঃ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। মোট কথা, নবী করীম (সাঃ) সারাটি জীবন শান্তি স্থাপনের জন্য অতিবাহিত করলেন, শান্তি স্থাপনের জন্যই হুযূর (সাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মক্কার কাফেরদের লাঞ্ছনাজনক শর্তাবলীও গ্রহণ করে নিলেন যা সাহাবাগণ (রাঃ) কোনক্রমেই গ্রহণ করতে পারছিলেন না। শান্তি স্থাপনের জন্যই খোদাতা'লার আদেশ অনুযায়ী হুযূর (সাঃ) প্রিয়জনকে বললেন (৬ : ১০৯) و تسبوا الذين يدعون من دون الله

যে তোমরা তাদিগকেও গালি দিও না যাদিগকে তারা আল্লাহ্ ছাড়া ডাকে (সূরা আনআম : ১০৯ আয়াত)।

হুযূর (সাঃ) কথায় ও কাজে মনের পরম আকাংখা প্রকাশ করলেন যেন প্রত্যেকেই শান্তিকামী হয়। হুযূর (সাঃ) প্রত্যেকটি মানুষকে সাবধান করেছিলেন যে, খবরদার ! তোমরা কোন কাজ ও কোন কথা শান্তির পরিপন্থী করবেও না বলবেও না। হুযুর (সাঃ) যা আদেশ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে শান্তির উপাদান ; যা হতে বারণ করেছেন উহার মধ্যে নিহিত আছে অশান্তির আগুন। তার নিষেধাজ্ঞাসমূহে ইহা একটি গুরুত্বপুর্ণ নিষেধাজ্ঞা যে, তোমরা কোন ক্রমেই কাকেও 'কাফের' বলে সম্বোধন করবেন না। 'কাফের' বলা এমন একটি কটু বাক্য যা কোন কাফেরও পসন্দ করে না যে, তাকে কাফের বলা হোক। প্রকারান্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, কাকেও 'কাফের' বলা **একটি মারাত্মক অস্ত্র—বুমেরাং** এর ন্যায় এমন এক অস্ত্র যদ্বারা অস্ত্র ব্যবহারকারী নিজেই ধর্ম ক্ষেত্রে মারা পড়ে। অর্থাৎ সে তৎক্ষণাৎ মোমেনের গণ্ডি হতে বের হয়ে নিজে কাফের হয়ে যায়। হাদীস অনুযায়ী বর্তমান যুগে যে সকল মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাফের বলে আখ্যায়িত করছে তারা নিজেরাই কাফের হয়ে যাচ্ছে ; তাদের পিছনে একজন মোমেন মুসলমান কীরূপে নামায পড়তে পারে ? অতএব এই ব্যাপারে একজন মুসলমানকে খুবই সাবধান থাকা উচিত এবং ঈমানকে রক্ষা করে চলা উচিত। প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে মুসলমান বলেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর মত নামায পড়ে, তাঁর কিবলার দিকে মুখ করে এবং মুসলমানের হাতে যবাই করা পশুর মাংস খায়, সে মুসলমান। (বুখারী : কিতাবুস্ সালাত)

(অমৃতবাণীর অবশিষ্টাংশ)

না করে তাহলে তাদের অভিযোগ ও পরিতাপ নিষ্ফল। ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা উচিত। যতদূর সম্ভব ঐ লোক যেন (মুরশিদের) রীতিনীতি ও আকীদা-বিশ্বাসের রংঙ্গে রংঙীন হয়। (প্রবঞ্চনাকারী) আত্মা যে দীর্ঘ আয়ুর প্রতিশ্রুতি দেয় উহা একটি ধোঁকা মাত্র। আয়ুর কোনই বিশ্বাস নেই। সত্বর সত্যবাদিতা ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি ঝুঁকে যাওয়া উচিত এবং সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিসাব করা আবশ্যক (আমার মনে পড়ছে যে, এ বক্তব্য হযরত (আঃ) ঐ সময়ে বর্ণনা করেছিলেন যখন মুহাম্মদ নওয়াব খাঁ সাহেব তহশীলদার হুযূর (আঃ) নিকট বয়াত গ্রহণ করেছিলেন—সম্পাদক)।

(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪-৫)

(চলবে)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদ : মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ

পাপের আধিক্যের কারণে দোয়ার মধ্যে শিথিলতা যেন না হয়

পাপী স্বীয় পাপের আধিক্য প্রভৃতির কথা অধিক মনে করে অবশ্যই যেন দোয়া করা থেকে বিরত না হয়। দোয়া প্রতিশেধক বিশেষ। পরিশেষে দোয়ার দ্বারা দেখতে পাবে যে, পাপ তার নিকট খারাপ মনে হতে থাকবে। যারা পাপাচারে ডুবে থেকে দোয়ার কবুলিয়তের ব্যাপারে নিরাশ থাকে, এবং তওবার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে, তারা পরিশেষে নবী এবং তাঁদের প্রভাবের প্রতি অস্বীকারকারী হয়ে যায়।

তওবা বয়াতের অংশ কেন?

তওবার মাহাত্ম্য এই (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে) আর ইহা বয়াতের অংশ কেন? আসল কথা এই যে, মানুষ অলসতায় পড়ে রয়েছে। যখন সে বয়াত করে এবং এমন ব্যক্তির হাতে বয়াত করে যাঁকে আল্লাহ্ ঐ পরিবর্তনের শক্তি প্রদান করেছেন। তখন যেরূপে গাছের কলম কাটার দ্বারা গুণ পরিবর্তিত হয়ে যায় সেরূপে এ সংযোজনার দ্বারাও তার মধ্যে ঐ সব কল্যাণ ও নূর আসতে শুরু করে। (যা ঐ পরিবর্তনশীল মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় কিন্তু শর্ত হল, তাঁর সাথে খাঁটি সম্পর্ক স্থাপিত হতে হবে। শুষ্ক শাখার মত যেন না হয় বরং তার শাখা হয়েই সংযোজন থাকবে। যে পরিমাণে সম্পর্ক থাকবে সে পরিমাণে উপকৃত হবে।

বয়াত কখন উপকারে আসে

কেবল আনুষ্ঠানিক বয়াত কোন উপকারে আসে না। এমন (সত্যিকারের বয়াতে) বয়াতের অংশীদার হওয়া কঠিন কাজ। তখনই অংশীদার হবে যখন নিজের সত্তাকে পরিত্যাগ করে পরিপূর্ণ প্রেম, ভালবাসা ও নিরংকুশ নিষ্ঠার সাথে তার সংগী হয়ে যাবে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাথে মোনাফেকদের সত্যিকারের সম্পর্ক সৃষ্টি না হওয়ার কারণে পরিশেষে তারা বেঈমান থেকে গেল। তাদের সত্যিকার প্রেম-ভালবাসা ও নিরংকুশ নিষ্ঠা সৃষ্টি হয়নি। এজন্যে বাহ্যিক "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলা কোন কাজে আসে নি। তাই এসব সম্পর্ক বৃদ্ধিকরণ হলো জরুরী বিষয়। যদি এসব সম্পর্কাদির (প্রত্যাশী না হর) তারা বৃদ্ধি না করে এবং তারা যদি চেষ্টা

(অবশিষ্টাংশ ৪-এর পাতায় দেখুন)

হাকীকাতুল ওহী

[মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী]

ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(১৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এই সা'দউল্লাহ্ সম্পর্কেই তিন হাজার টাকার পুরস্কার সম্বলিত প্রচারিত বিজ্ঞাপনের ১২ পৃষ্ঠায় ১৮৯৪ সালের ৫ই অক্টোবরে খোদাতা'লার নিকট হইতে ইলহাম পাইয়া আমি নিম্নলিখিত এবারত লিখিয়াছিলাম। ইহা আমার আনোয়ারুল ইসলাম গ্রন্থে যুক্ত করা হইয়াছে। এবারতটি এই যে :—

"সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে থাক। হে মৃত! অবশেষে তুমি দেখিবে তোমার কি পরিণতি হয়। হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি আমার সহিত নহে খোদার সহিত লড়িতেছ। খোদার কসম আমার নিকট এখনই ১৮৯৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর এ তোমার সম্পর্কে এই ইলহাম হইয়াছে ان شانئك هو الابتر। এই ইলহামী কথার অর্থ এই যে, সা'দউল্লাহ্ তুমি যাহাকে 'আবতার' বল এবং এই দাবী কর যে, তোমার পুত্রের বংশধারা ও অন্যান্য কল্যাণরাজি ছিন্ন হইয়া যাইবে, কখনো এইরূপ হইবে না। বরং সে নিজেই 'আবতার' থাকিবে।"

স্মরণ রাখা প্রয়োজন ان شانئك هو الابتر বাক্যটি আরবী ভাষায় তুলনা ব্যতীত ব্যবহার করা হয় না। অর্থাৎ এই বাক্যের জন্য ইহা জরুরী যে, প্রথমে কেহ 'আবতার' কহিল। অতঃপর ইহার মোকাবেলায় তাহাকে 'আবতার' বলা হইল। অতএব এই বাক্যটি এই কথার সাক্ষ্য যে, সা'দউল্লাহ্ আমাকে 'আবতার' বলিত এবং আমার ব্যাপারে সে চাইত যে, আমি সকল প্রকার কল্যাণ ও বরকত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া তাহার সম্মুখে মৃত্যু বরণ করি এবং আমার বংশও ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব সে যাহা কিছু আমার জন্য খোদার নিকট হইতে চাহিল খোদা তাহাকে ঐ সকল ফিরাইয়া দিলেন। আমি তাহার 'আবতার' হওয়া ও ব্যর্থ অবস্থায় মৃত্যু প্রথমে চাহি নাই। সে আমার সম্মুখে মরিয়া যাক। ইহাও আমি চাহি নাই। কিন্তু সে এই সকল ব্যাপারে অগ্রগামী হইল, তাহার 'সেহাব সাকেব' এ আমার মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিল, সে আমার মনে কষ্ট দিল, এবং সীমাতিরিক্ত কষ্ট দিল, তখন চার বৎসর পরে আমি তাহার জন্য দোয়া করিলাম। এমতাবস্থায় খোদা আমাকে তাহার মৃত্যুর খবর দিলেন। এতদ্ব্যতীত খোদা আরো বলেন, যে সা'দউল্লাহ্ তোমার 'আবতার' হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে সে নিজেই 'আবতার' থাকিবে। **কিন্তু আমি তোমার বংশকে কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখিব এবং তুমি আশীষরাজি হইতে**

বঞ্চিত হইবে না। আমি তোমাকে এত আশীষ দান করিব যে, বাদশাহও তোমার বস্ত্র হইতে আশীষ অন্বেষণ করিবে। এবং বিপুল সংখ্যক মানুষকে তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করাইব। কিন্তু সা'দউল্লাহ্ কল্যাণ ও আশীষ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া তোমার চক্ষুর সম্মুখে লাঞ্ছনার সহিত মরিবে। সুতরাং এইরূপই ঘটিল। ইহা হইল খোদার ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা টলিতে পারে না। যদি এই সকল কেবল মৌখিক কথা হইত তবে কোন বিরুদ্ধবাদী আজ আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী মানিত? কিন্তু এই সকল কথা আজ হইতে বার বৎসর পূর্বে আমার গ্রন্থসমূহে ও বিজ্ঞাপনাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা কোন বিরুদ্ধবাদীর এড়াইয়া যাওয়ার উপায় নাই। তাহারাই এইগুলি এড়াইয়া যাইতে পারে যাহারা লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়া আবু জাহলের ন্যায় দিবালোককে রাত্রি বলে এবং কিরণ-দানকারী সূর্য্যকে জ্যোতিহীন সাব্যস্ত করে। তদ্রূপেই যদি সা'দউল্লাহ্ আমার মৃত্যু ও লাঞ্ছনা এবং আমার জামাতের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে তাহার পুস্তক 'সেহাব সাকেব' এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ না করিত, তবে এখন আমার কথা কে মানিয়া লইত? কিন্তু খোদার শোকর যে, উভয় পক্ষ হইতে মোবাহালার আকারে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হইয়া গেল এবং দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া গেল পরিশেষে কাহার অনুকূলে খোদা-তা'লা ফয়সালা দিলেন।

ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যদিও সা'দউল্লাহ্ সম্পর্কে আমার গ্রন্থাদিতে কোন কোন কঠোর শব্দ দেখিতে পাইবে এবং অবাক হইবে কেন তাহার সম্পর্কে এইরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছে, তথাপি এইরূপ অবাক ভাব তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া যাইবে যদি তোমরা তাহার অশ্লীল কবিতা ও গদ্য দেখ। ঐ হতভাগা কটুভাষা ও গাল-মন্দে এতখানি অগ্রসর হইয়াছিল যে, আমি কখনো মনে করি না আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আবু জাহল ততখানি অগ্রসর হইয়াছিল। বরং আমি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি, খোদার যত নবী পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের মোকাবেলায় এইরূপ কোন কটুভাষী দুশমন প্রমাণিত হয় না যেমনটি ছিল সা'দউল্লাহ্। সে বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার ক্ষেত্রে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। মেথর ও চামারদেরও এতখানি অশ্লীল গাল-মন্দ মনে থাকে না, যতখানি সা'দউল্লাহ্র মনে থাকিত। কঠোর হইতে কঠোরতর শব্দ এবং নাপাক হইতে নাপাকতর গালি-গালাজ এত মারাত্মক ও নির্লজ্জতার সহিত তাহার মুখ হইতে বাহির হইত যে, কোন ব্যক্তি তাহার মায়ের পেট হইতে এইরূপ কুস্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ না করিলে এইরূপ স্বভাবের মানুষ হইতেই পারে না। এইরূপ মানুষের চাইতে সাপের বাচ্চাও উত্তম হইয়া থাকে। আমি তাঁহার কটুভাষায় অনেক ধৈর্য ধারণ করিয়াছি এবং নিজেকে সম্বরণ করিয়াছি। কিন্তু যখন সে সীমা

ছাড়াইয়া গেল এবং তাহার অভ্যন্তরীণ নোংরামীর ভাণ্ডার উন্মোচিত হইয়া গেল তখন আমি সৎ উদ্দেশ্যে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিলাম, যাহা সময়োপযোগী ছিল। যদিও আমার উপরোল্লিখিত শব্দাবলী বাহ্যতঃ কিছুটা কঠোর তথাপি ঐগুলি অশ্লীল গাল-মন্দের শ্রেণীভুক্ত নহে, বরং ঐগুলি ঘটনার প্রেক্ষাপটে এবং ঠিক সময়ের প্রয়োজনে লিখিত হইয়াছে। সকল নবীই সহিষ্ণু ছিলেন। কিন্তু তাহাদের সকলকে ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে নিজেদের দুশমন সম্পর্কে এইরূপ শব্দাবলী ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ বাইবেলে খুবই বিনম্র শিক্ষার দাবী করা হইয়াছে। তদসত্ত্বেও এই সকল বাইবেলে ফিকাবিদ জ্ঞানীদের ও ইহুদী আলেমদের সম্পর্কে এই সকল শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখি যে, তাহারা প্রতারক, খল ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী। তাহারা সাপের বাচ্চা। তাহারা নেকড়ে। তাহারা অপবিত্র স্বভাববিশিষ্ট। তাহাদের অভ্যন্তর মন্দ। পতিতারাও তাহাদের পূর্বে বেহেশ্‌তে যাইবে। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে হারামজাদা প্রভৃতি শব্দ মজুদ আছে। অতএব ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল শব্দ সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য ঐগুলি গাল-মন্দের অন্তর্ভুক্ত নহে। কোন নবী কটুভাষায় অগ্রগামী ছিলেন না। বরং যখন মন্দবিশিষ্ট কাফেরদের কটুভাষা চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে তখন খোদার সম্মতিক্রমে বা তাঁহার ওহীর দ্বারা তাঁহারা এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

তদ্রূপেই সকল বিরুদ্ধবাদী সম্পর্কে আমি এই রীতিই অনুসরণ করিয়াছি। কেহ প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, আমি কোন বিরুদ্ধবাদী সম্পর্কে তাহার কটুভাষার পূর্বে স্বয়ং কটুভাষায় অগ্রগামী হইয়াছি। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী যখন সাহসিকতার সহিত উচ্চস্বরে আমার নাম দাজ্জাল রাখিল, আমার বিরুদ্ধে কুফরীর ফতোয়া লেখাইয়া পাঞ্জাব ও ভারতের শত শত মৌলবী দ্বারা আমাকে গালি-গালাজ করাইল, আমাকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের চাইতে নিকৃষ্ট সাব্যস্ত করিল এবং আমার নাম মিথ্যাবাদী, ফাসাদ সৃষ্টিকারী, দাজ্জাল, 'মুফতারী' (যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বানাইয়া বলে), প্রতারক, ঠগবাজ, অবাধ্য, পাপাচারী ও আত্মসাৎকারী রাখিল, তখন খোদা আমার হৃদয়ে প্রেরণা দান করিলেন যে, সৎ উদ্দেশ্য লইয়া এই সকল লেখার প্রতিরোধ কর। আমি প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কাহারো দুশমন নহি। আমি প্রত্যেকের কল্যাণ করিতে চাহি। কিন্তু যখন কেহ সীমা-লংঘন করে তখন আমি কি করিব। আমার বিচার খোদার নিকট। এই সকল মৌলবীরা আমাকে কষ্ট দিয়াছে, সীমাতিরিক্ত কষ্ট দিয়াছে। তাহারা আমাকে হাসি-বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল বানাইয়াছে। কাজেই আমি

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزءون ○

(সূরা ইয়াসীন—আয়াত ৩১) (অর্থঃ পরিতাপ। বান্দাগণের জন্য, তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহাদের প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই—(অনুবাদক) ছাড়া আর কি বলিব।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সা'দউল্লাহ্ আমার মোকাবেলায় দুইবার মোবাহালার লক্ষ্যস্থল হইয়া গিয়াছে। প্রথমে ঐ সকল আরবী কবিতায়, যাহা 'আঞ্জামে আথম' এ লিখিয়াছি। মোবাহালাস্বরূপ আমি দোয়া করিলাম যে, খোদা মিথ্যাবাদীকে ধ্বংস করুন।

বস্তুতঃ এই সকল মোবাহালার আরবী কবিতাগুলির মধ্যে একটি কবিতা নিম্নরূপঃ-

"হে খোদা, তুমি আমার ও সা'দউল্লাহ্র মধ্যে ফয়সালা কর। তুমি আমার হৃদয়ের অবস্থা জান। হে সা'দউল্লাহ্, তুমি নোংরামীর দ্বারা আমাকে কষ্ট দিয়াছ। যদি আমার সম্মুখে লাঞ্ছনার সহিত তোমার মৃত্যু না হয় তবে আমি মিথ্যাবাদী।"

অতঃপর দ্বিতীয়বার আমি সা'দউল্লাহ্কে মোবাহালার লক্ষ্যস্থল বানাইলাম। উহার উল্লেখ আমার গ্রন্থ 'আঞ্জামে আথম' এর ৬৭ পৃষ্ঠায় আছে। তাহাদের নামের তালিকা আমার উক্ত গ্রন্থ 'আঞ্জামে আথম' এর ৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ৭২ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। মোবাহালার আহবানে 'আঞ্জামে আথম' এর ৬৭ পৃষ্ঠায় ভূমিকা লিপিবদ্ধ আছে। ভূমিকাটি নিম্নরূপঃ—

"হে জমীন ও আসমান! তোমরা সাক্ষী থাক খোদার অভিসম্পাত ঐ ব্যক্তির উপর বর্ষিত হইবে, যে এই লেখা পৌঁছার পর মোবাহালার জন্য উপস্থিত হইবে না এবং কুফরী ফতোয়া ও অবমাননা পরিত্যাগ করিবে না ও বিদ্রূপকারীদের মাহফেল হইতে দূরে থাকিবে না। হে মোমেনগণ! তোমরা সকলে খোদারওয়াস্তে আমীন বল।" 'আঞ্জামে আথম' গ্রন্থে কঠোর শত্রুদিগকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে এবং ইহাতে এইরূপ লোকদের তালিকা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই তালিকার ৭০ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনটিই দেখ। প্রথম লাইনের উপরেই এই হতভাগ্য সা'দউল্লাহ্র নাম লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুতঃ লেখা আছে; **সা'দউল্লাহ্, মও মুসলিম শিক্ষক, লুধিয়ানা।**

এই মোবাহালার পর অদ্যাবধি বার বৎসর তিন মাস ও কয়েক দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইহার পর অধিকাংশ লোক মুখ বন্ধ করিল। যাহারা কটুভাষা হইতে বিরত হইল না তাহাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছে যাহারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে নাই, বা কোন না কোন লাঞ্ছনার শিকার হয় নাই। বস্তুতঃ নজির হোসেন দেহলবী ইহাদের দলপতি ছিল। সে মোবাহালার আহ্বানে প্রথম আহুত ব্যক্তি। সে নিজের যোগ্য পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া 'আবতার' অবস্থায় পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রশিদ আহমদ গঙ্গুহীর নাম মোবাহালার আহ্বানের ৬৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। মোবাহালার আহ্বানের ও বদদোয়ার পর সে অন্ধ হইয়া গেল। অতঃপর সাপের কামড়ে সে মরিয়া গেল। মৌলবী আবদুল আযীয লুধিয়ানুভী ও মৌলবী মোহাম্মদ লুধিয়ানুভীর উল্লেখও এই ৬৯ পৃষ্ঠাতেই আছে। মোবাহালার আহ্বানের পর

ইহাদের উভয়েই এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অনুরূপভাবে মৌলবী গোলাম রসূল আরেক রসূল বাবার উল্লেখ মোবাহালার আহ্বানের ৭০ পৃষ্ঠায় আছে। মোবাহালার আহ্বানের ও বদদোয়ার পর সে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া অমৃতসরে মরিয়া গেল। অনুরূপভাবে মৌলবী গোলাম দস্তগীর কাসুরীর উল্লেখ 'আঞ্জামে আথম' গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় আছে। সে নিজেও তাহার মোবাহালা স্বীয় পুস্তক 'ফয়েযে রহমানী'তে প্রকাশ করিয়াছিল। এই পুস্তক প্রণয়নের এক মাস পরে সে মরিয়া গেল। তাহার মৃত্যুর ইহাই কারণ নহে যে, আমি 'আঞ্জামে আথম'-এর ৬৯ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ এই পৃষ্ঠার ১৭তম লাইনে সে ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদী, যাহারা দুষ্টামী হইতে বিরত হইবে না ও মোবাহালা করিবে না, তাহাদের জন্য বদদোয়া করিয়াছিলাম এবং তাহাদের জন্য খোদার আযাব চাহিয়াছিলাম, বরং তাহার নিজের মোবাহালাও তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়া গেল। কেননা, সে আমার ও তাহার নিজের উল্লেখ করিয়া খোদাতা'লার নিকট যালেমের মৃত্যু চাহিয়াছিল। অতএব ইহার কয়েক দিন পরেই সে মরিয়া গেল। এই ৭০ পৃষ্ঠাতেই মৌলবী আজগর আলীর নাম লিপিবদ্ধ আছে। সে-ও ঐ সময় পর্যন্ত কটুভাষা হইতে বিরত হইল না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতা'লার ক্রোধে তাহার একটি চক্ষু বাহির হইয়া গেল। অনুরূপভাবে এই মোবাহালার তালিকায় মৌলবী আবদুল মজীদ দেহলবীর উল্লেখ আছে। সে ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে কলেরায় মারা গেল। * অনুরূপভাবে আরো অনেক লোক ছিল। তাহাদিগকে ওলামা বা সাজ্জাদনশীন বলা হইত। এই মোবাহালার আহ্বানের পর তাহারা কটুভাষা ও গালমন্দ হইতে বিরত হইল না। এই জন্য খোদাতা'লা তাহাদের কাউকে কাউকে মৃত্যুর পেয়ালা পান

---

* টীকা : যখন আমি প্রথম দিল্লী গিয়াছিলাম আব্দুল মজীদ স্বয়ং আমার গৃহে আসিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে, এই ইলহাম শয়তানী ইলহাম। সে মোসায়লামা কায্যাবের সহিত আমাকে সাদৃশ্যযুক্ত করিল এবং আমাকে বলিল, যদি তুমি তওবা না কর তবে বানোয়াট ইলহাম ও খোদার নামে মিথ্যা বানাইয়া বলার ফল ভোগ করিবে। আমি বলিলাম, যদি আমি মিথ্যা বানাইয়া বলি তবে আমি ইহার শাস্তি পাইব। অন্যথা যে আমাকে মিথ্যা বানোয়াটকারী বলে সে শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারিবে না। অবশেষে আব্দুল মজীদ আমার জীবদ্দশাতেই তাহার এই অশ্লীল মোবাহালার পর মরিয়া গেল। এই সময় সে আমার মোকাবেলায় আমাকে প্রত্যাখান করার ব্যাপারে কঠোর ভাষায় একটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করিয়া ছিল এবং সম্ভবতঃ উহার কপি এক পয়সায় বিক্রয় করিয়াছিল।

করাইলেন। কেহ কেহ বিভিন্ন প্রকারের লাঞ্ছনার শিকার হইয়া পড়িল। কেহ কেহ পার্থিব প্রতারণা, ধোঁকা ও ধন উপার্জনের নোংরা কাজে এতখানি জড়াইয়া পড়িল যে, তাহাদের নিকট হইতে ঈমানের স্বাদ ছিনাইয়া নেওয়া হইল। তাহাদের একজনও এই বদদোয়ার ক্রিয়া হইতে রক্ষা পাইল না। যেহেতু সা'দউল্লাহ্ তাহার কটু ভাষায় সকলের চাইতে বেশী অগ্রসর হইয়াছিল। তাই কেবল ব্যর্থতার সহিতই মৃত্যু হয় নাই, বরং সে সকল প্রকার লাঞ্ছনার অংশীদার হইল। সারা জীবন চাকুরী করিয়াও তাহার পেট ভরিল না। অবশেষে মৃত্যুর নিকটবর্তী হইয়া খৃষ্টানদের স্কুলে চাকুরী গ্রহণ করিল। তাহার অদৃষ্টে এই সকল লাঞ্ছনাতো জুটিলই, তদুপরি তাহাকে শেষ লাঞ্ছনাও দেখিতে হইল। পাদ্রীরা ইসলাম ধর্মের দুশমন। তাহাদের স্কুলগুলিতে ইসলাম বিরোধী বক্তৃতা দেওয়া একটি শর্ত। প্রতি দিন বা প্রত্যেক সপ্তম দিনে স্কুলে হযরত ঈসার ঈশ্বরত্বের ব্যাপারে বিপদগামিতামূলক কথা শুনানো তাহাদের নীতি। তাহাদের চাকুরী গ্রহণ করা সে সহ্য করিয়া লইল। আরবী ভাষায় নিঃস্ব ব্যক্তিকেও 'আবতার' বলা হয়, অর্থাৎ এইরূপ নিঃস্ব ব্যক্তিকেও যে সব পুঁজি খোয়াইয়া বসে। সে নিজেকে এই ধরনের 'আবতার' হওয়ার প্রতীকও প্রমাণিত করিল। কেননা, যদি সে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করিত তবে সে নিজের শেষ দিনগুলিতে পাদ্রীদের দরজায় ভিক্ষাবৃত্তি করিত না। যাহারা নিজেদের কলেজ ও স্কুলে আবশ্যকীরভাবে ইসলাম বিরোধী শিক্ষা দেয় তাহাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করা কোন খাঁটি মুসলমানের নীতি হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন:

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২১ মার্চ ১৯৯৭ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা ইয়াসীনের ৬১—৬৩ তম আয়াত তেলাওয়াত করেন।

الم اعهد اليكم يابنى ادم ان لا تعبدوا الشيطان - انه لكم عدو مبين ○ وان اعبدونى - هذا صراط مستقيم ○ ولقد اضل منكم جبلا كثيرا - افلم تكونوا تعقلون ○

অতঃপর বলেন :

এ আয়াতসমূহের তরজমা হচ্ছে : হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের উপর এই অঙ্গীকার বাধ্যতামূলকভাবে ন্যস্ত করি নি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত (উপাসনা) করবে না। সে তো নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর (এই যে,) তোমরা আমার উপাসনা করবে। এটাই হচ্ছে সীরাতে মুস্তাকীম (সত্য-সরল-সুদৃঢ় পথ)। সে তো তোমাদেরই মধ্য থেকে বহুজনকে পথভ্রষ্ট করেছে। 'লাকাদ' শব্দটির অর্থে পূর্বোল্লেখিত বিষয়টি অন্তর্নিহিত রয়েছে এই বলে যে, ঐ কাজটা সে আগেই ঘটিয়েছে। তোমরা জান যে, বৃহদ-সংখ্যক এরূপ লোক রয়েছে যাদেরকে সে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করেছে। 'আফালাম তাকূন তা'কেলুন'—তোমরা কি বুদ্ধিমানদের অন্তর্ভুক্ত হবে না? যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

এ আয়াতসমূহ ঐ বিষয়-বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত যা ইতোপূর্বে (কয়েক খোৎবা জুড়ে ধারাবাহিকরূপে) অব্যাহত রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহতা'লার মাগফিরাত বা ক্ষমা সংক্রান্ত ঐ ওয়াদার দ্বারা আমরা কি করে উপকৃত হতে পারি যে ওয়াদাটিতে তিনি বলেন যে, "হে আমার বান্দাগণ! আমার ক্ষমা সম্পর্কে তোমরা নিরাশ হবে না। আমি ইচ্ছা করলে সকল গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারি।" এই মহান ওয়াদার পর ঐ শর্তগুলো কী—যা পালন করার ফলশ্রুতিতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার অগাধ রহমতপ্রসূত মাগফিরাত বা ক্ষমার ছায়াতলে আসতে পারি এবং তদ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারি। বস্তুতঃ রহমত বা করুণা থেকেই মাগফিরাত বা ক্ষমা প্রস্ফুটিত হয়। এবং আল্লাহ্তা'লার সেই মৌলিকগুণ যা মাগফিরাতের দ্বারা সকল সৃষ্টজীবকে আচ্ছাদিত করে তা হলো 'রাহমানিয়্যতের' গুণ। অতএব, এ বিষয়-বস্তুটিকে সকলের সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে

সূরা আল ফুরকানের ঐ আয়াতসমূহ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম যেগুলোতে 'ইবাদুর রহমান' (—রহ্মান খোদার বান্দাগণের গুণ ও বৈশিষ্ট্য) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, তোমরা যদি মাগফেরাতের আকাঙ্খা পোষণ কর, তাহলে সে মাগফিরাত তো 'রহ্মানে'র কাছ থেকেই লাভ হবে। রহ্মানের বান্দা হতে হবে। ঐ ধারায় যদি রহ্মান খোদার বান্দায় পরিণত হতে পার, তাহলে তোমাদের পক্ষে মাগফিরাত লাভের আকাঙ্খা যথার্থ ও সার্থক হবে। এতদ্ব্যতিরেকে তোমাদের এই প্রত্যাশা যে, রাহমানীয়্যতে নিহিত এ ফয়েয ও কল্যাণ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক এরূপ প্রত্যাশা মন থেকে মুছে ফেল। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার কোন আবিষ্কার নন। তিনি আপনাদের আবেগ-আকাঙ্খাপ্রসূত কোন কাল্পনিক ও হেয়ালি বস্তুও নন। (আপনাদের) ধ্যান-ধারণা ও আবেগ-অনুভূতিকেই বরং তাঁর সমীপে মাথা নোয়াতে হবে। তিনি হচ্ছেন চিরন্তন বাস্তব সত্য, যা কারো কল্পনার ফসল বা আবিষ্কার নয়। (বরং) মানব-কল্পনাকে তাঁর সম্মুখে বিনত হতে হবে এবং সেভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সেই রঙে-রঞ্জিত হতে হবে যা তিনি মানবের নিকট প্রত্যাশা করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আমি আপনাদের সম্মুখে কুরআন করীমের সে কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করি, যেগুলোতে স্বয়ং তিনি আপনাদেরকে রহমান খোদার ইবাদ বা বান্দায় পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে আপনাদের কাছে কতিপয় প্রত্যাশা তুলে ধরেছেন, এই বলে যে, ইবাদুর রহমান যদি হতে চাও তাহলে এরূপ হয়ে যাও বা ওরূপ হয়ো না—এমনি ধারায় তোমরা ইবাদুর রহমানের দলভুক্ত হতে পারবে। (সূরা আল্ ফুরকান, ৬৪- ৭৮ তম আয়াত)

এখন যে আয়াতসমূহ আমি (খোৎবার প্রারম্ভে) পেশ করেছি, এগুলোতে এরূপ একটি শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে যা পুরণ না করলে আপনারা কখনও ইবাদুর রহমানে পরিণত হতেই পারেন না। সে শর্তটি হচ্ছে যে, তোমরা ইবাদুশ্-শয়ত্বান —শয়তানের বান্দায় পরিণত হয়ো না। প্রথমে এই নেতিবাচক শর্তটি যদি পুরণ করেন তাহলেই ইতিবাচক গণ্ডীতে প্রবেশ করতে পারবেন। যদি তা পুরণ না করেন তাহলে উচ্চমানের সুফল সম্বলিত ইতি-বাচক স্তরে উত্তরণ সম্ভবই নয়। কতক বিধিনিষেধ থাকে, যা না মানলে ঔষধ কোন কাজ করে না। যদি কিছু কিছু বিষও পান করা হয় তাহলে সেই সাথে প্রতিষেধকের অন্বেষণ নিঃরর্থক হয়ে থাকে। যদি বিষ খেতেই থাকেন তাহলে প্রতিষেধকও নিষ্ফল হবে। উক্ত আয়াতগুলোও অনুরূপ বিষের সাথেই সম্পর্কযুক্ত (—এগুলোতে সেই বিষের উল্লেখ করা হয়েছে) যা পান করতে থাকলে আপনাদের উপর থেকে খোদাতা'লার রহমতকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। উহা আপনাদেরকে দেওয়াই হবে না। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এ আয়াত-সমূহের সম্পর্কও সূরা ফাতেহার সাথেই যুক্ত, —যেখানে রাহ্মানীয়্যতের ও ইবাদতের বিষয়-

বস্তুকে খোলাসা করে বিশদভাবে পেশ করা হয়েছে, এবং এ বিষয়টি বুঝে নেওয়ার ফল-শ্রুতিতে বেশ কিছু এরূপ বিষয় আপনাদের বোধগম্য হয়ে পড়বে, যদ্দরুণ আপনারা শয়তানের ইবাদত বা আরাধনা থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হবেন। নইলে, শুধু একথা বলা যে, শয়তানের আরাধনা থেকে বাঁচো কিন্তু বাঁচার উপায় সম্পর্কে সবিস্তারে অবহিত না করা এবং তা বুঝিয়ে না বলা এটা আল্লাহ্‌তা'লার মর্যাদা বিরোধী (তাঁর পক্ষে অশোভনীয়)। তাই আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টির উপর বিশদভাবে আলোক-পাত করেছেন যে, শয়তানের ইবাদত বলতে কি বুঝায়, ইহার স্বরূপ কী এবং এথেকে বাঁচারইবা উপায় কী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সূরা ফাতেহার (মধ্যেকার স্পষ্ট ইঙ্গিতের) মাধ্যমে উক্ত বিষয়টি খোলাসা করে বর্ণনা করা হয়েছে। দৃশ্যতঃ ইঙ্গিত হলেও তাতে সুস্পষ্ট বিষয়-বস্তু অন্তর্নিহিত রয়েছে। অতএব, দেখুন সূরা ফাতেহার সাথে এর কত (গভীর) সম্পর্ক বিরাজমান! (যেমন,) আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে: "আনে'বুহুনী, হাযা সিরাতু মুস্তাকীম"। আর সূরা ফাতেহায় আছে: "ইয়াকানা'বুহু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল মুস্তাকীম"। মাঝের এক একটি শব্দ ছুটে গিয়েছে বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং সূরা ফাতেহার গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে অনিবার্যভাবে আপনার দৃষ্টিকে সূরা ফাতেহার পথে পরিচালিত করা হয়েছে। "সিরাতে মুস্তাকীম"-এর পরে আবার "মগযুব" শব্দটি বাদ দিয়ে "যাল্লীন"-শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এতএব, বলা হয়েছে: "লাকাদ আযাল্লা মিন্‌কুম জিবিল্লান কাসীরা"। অদ্ভুত আল্লাহ্‌র এই শান ও মর্যাদা যে, তিনি বিভিন্ন স্থানে পথ-চিহ্ন নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। যদিও সবিস্তারে সূরা ফাতেহার পুনরাবৃত্তি করা হয় নি, কিন্তু সূরা ফাতেহার এতো সুনিশ্চিত আলামত ও চিহ্নাবলী রেখে দেয়া হয়েছে যে, কোনও মানুষের দৃষ্টি ঐ পথ হতে বিচ্যুত হয়ে অন্য দিকে যেতেই পারে না। অতএব, "ইয়াকানা'বুহু" থেকে "ওয়ালায্‌যাল্লীন" পর্যন্তের বরাত দিয়ে আপনাদেরকে জানানো হয়েছে যে, শয়তানের যদি তোমরা ইবাদত কর, তাহলে এ সকল নেয়ামত লাভের সৌভাগ্য তোমাদের ঘটবে না। আল্লাহ্‌র সত্যিকার ইবাদত ও সিরাতে মুস্তাকীম এবং যাল্লীনের দলভুক্ত হওয়ার অভিশাপ থেকে বাঁচার নেয়ামতসমূহ লাভ করা তোমাদের ভাগ্যে জুটবে না। এতে চিহ্নিত করণের পর্ব তো সম্পন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু এরপর শয়তানকে চেনার ও সনাক্ত করার এবং তার ইবাদত থেকে বাঁচার উপায়সমূহ কোথায় গেলো? বস্তুতঃ তা বর্ণিত হয়েছে সূরা ফাতেহায় ইতোপূর্বে বর্ণিত (প্রারম্ভিক) অংশে। ঐ (প্রারম্ভিক) আয়াতসমূহ সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে বরং প্রকাশ্যভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। যখন আপনারা সূরা ফাতেহার "ইয়াকানা'বুহু" অংশটিতে পৌঁছেন, অর্থাৎ তাতে বলেন যে, "আমরা তোমারই ইবাদত এবং একমাত্র তোমারই ইবাদত করি" তখন কেন এই স্থির

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন ? এর কারণ এই যে, ইতোপূর্বে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর এক পরিচিতি তুলে ধরেছেন। আর সে পরিচিতিটি এই যে, তিনি হচ্ছেন "রাব্বুল আলামীন, তিনি রহ্‌মান ও রহীম এবং মালিকে ইয়াওমিদ্দীন"। উক্ত সদগুণ চতুষ্টয় যদি কারো মাঝে বিদ্যমান থাকে, তাহলে অবলীলায় মানবাত্মা তার ইবাদতের জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। তবে উক্ত চারটি গুণ সম্পর্কে কেবল মস্তিষ্কের সাথে জড়িত জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এই সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে সেই জ্ঞান আবশ্যকীয় যা 'হাক্কুল-একীন' (—অভিজ্ঞতামূলক) পর্যায়ের জ্ঞান (সম্পন্ন) হয় এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা লাভ হয় এই বলে যে, হাঁ বাস্তবতঃ এমনিই। এই ধারায় উক্ত চারটি গুণ যদি কোথাও আপনাদের কাছে পরিদৃষ্ট হয় তা হলে অনিবার্যতঃ আপনাদের আত্মা সেই সত্তার ইবাদত করবে। এখন শয়তানকে সনাক্ত করার পন্থা ও পদ্ধতি বুঝিয়ে দেয়া হলো, শিখিয়ে দেয়া হলো। আল্লাহ্‌ বলছেন যে, রাহ্‌মানীয়্যতের (—অযাচিত দান) ক্ষেত্রেও তোমরা যদি শয়তানের তথা গয়ের-আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে যাচ্ছো,—রহীমিয়্যতের ক্ষেত্রেও যদি গয়ের-আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকছো অথবা রুবুবিয়্যতের ক্ষেত্রে যা প্রকৃতপক্ষে প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত ছিল—যদি তোমরা গয়ের আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে যাচ্ছো এবং তাকেই মালিকে-ইয়াওমিদ্দিন বলেও ভাব, তাহলে অবধারিত-ভাবে তোমরা তার ইবাদত করবে। এমতাবস্থায় তোমরা কখনও ঐ স্তরে পৌঁছতে পার না যেখানে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এই আওয়াজ উত্থিত হয় (এবং এ শব্দগুলো উচ্চারিত হয়) যে, "ইয়াকানা'বুহু" (—হে খোদা ! একমাত্র তোমারই ইবাদত করি)। বস্তুতঃ এক্ষেত্রে শয়তানী চারিত্রিক গুণকে নেতিবাচক ধারায় এভাবে পেশ করে দেয়া হয়েছে যে, যেখানে (আসলে) রুবুবীয়্যত নেই সেখানে রুবুবীয়্যতকে স্থাপন (বা স্বীকার) করা। যেখানে (আসলে) রাহ্‌মানীয়্যত নেই, সেখানে রাহ্‌মানীয়্যত ধরে নেওয়া, রহীমিয়্যত যেখানে নেই সেখানে রহীমিয়্যতের মাকাম বলে ভেবে বসা, যেখানে (মূলতঃ) মিলকীয়্যত বা মালে-কীয়্যত নেই সেখানে উহাকে কল্পনায় ধারণ করা। এইরূপ করলে তোমরা অনিবার্যতঃ মুশরেক হয়ে যাবে। ইবাদতের ধারা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। বস্তুতঃ শিরকের সবচে' ভয়াবহ সংজ্ঞা এটাই যা এ আয়াতসমূহে তুলে ধরা হয়েছে। সে-জন্যই আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, "আমি কি তোমাদের কাছে (বাধ্যতামূলক) অঙ্গীকার গ্রহণ করি নি যে, শয়তানের ইবাদত করবে না। অতএব, এই 'ইবাদত' শব্দটির মাধ্যমে অঙ্গীকার নেওয়া এই বলে যে, শয়তানের ইবাদত করবে না ইহা এই বিষয়-বস্তুটিকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, "ইয়াকানা'বুহু"তো খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে বলবে, অথচ রাব্ব্‌, রাহ্‌মান, রহীম এবং মালেক শয়তানকে মনে করবে—এ সেই ইবাদত যাথেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে।

"আ'হাদ ইলাইকুম" শব্দগুলো বাগধারায় সাধারণ অঙ্গীকার থেকে ভিন্নতর অঙ্গীকারকে বুঝায়। এক ধরনের অঙ্গীকার হয়ে থাকে যার মধ্যে দুইপক্ষ অংশীদার হয়ে থাকে। এধরনের অঙ্গীকারকে "মুয়াহাদা" বলা হয়। সুতরাং কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তা'লা নবীদের মাধ্যমে অঙ্গীকার নিয়েছেন এই বলে যে, তোমরা এই করবে, আমি এই করবো। আরেক ধরনের অঙ্গীকার হচ্ছে যা প্রবল ও ক্ষমতাশালী কোন অস্তিত্ব তার অধীনস্থদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। উহাতে দ্বিপাক্ষিক অঙ্গীকার থাকে না। বরং তাতে বলা হয় যে, তোমরা আমার কাছে ওয়াদা কর যে, ভবিষ্যতে তোমরা এই কাজ করবে (বা ঐ কাজ করবে না) যখন আপনারা কোন নবীনকে একথা বলেন এবং তাকে ওরূপ করতে বাধ্য করেন, তখন এটা হচ্ছে 'আ'হ্‌হাদ ইলাইকুম' সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তু। সুতরাং হযরয ইমাম রাগিব লিখেছেন, এ বিষয়টি এ রকমের, যেমন কারো উপর অঙ্গীকারকে ফরয করে দেওয়া এবং তা রক্ষা করার জন্য তাগিদ করা। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা বলছেন যে, আমি কি চিরকাল থেকেই তোমার উপর এই অঙ্গীকার বাধ্যকর করি নি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করতে পারবে না। যদি কর তাহলে 'ইয়াকা না'বুদু'-এর সম্পর্ক আমার থেকে ছিন্ন হয়ে যাবে। অতএব, শয়তানের ইবাদতকে চিনবার কি কি পদ্ধতি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হলো? বস্তুতঃ বর্তমানকালে দুনিয়া-জাহানে যেখানেই শয়তানের ইবাদত অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা প্রত্যেক গয়ের-আল্লাহ্‌কে রব্ব্, রহমান, রহীম অথবা মালেক মনে করার ফলশ্রুতিতেই হচ্ছে। গয়ের-আল্লাহ্‌র থেকে উক্ত চারটি গুণকে যদি সরিয়ে দেন তাহলে কারো পাদুকার অগ্রভাগও (অর্থাৎ কস্মিনকালেও কেউ) ঐ অস্তিত্বকে সেজদা করবে না। কেননা, প্রত্যেক সিজদা কোন না কোন লাভকে চায়। প্রত্যেক ইবাদতের ফলশ্রুতিতে কিছু না কিছু অর্জন করা হয়। আর আল্লাহতা'লার ইবাদতের ফলে যেখানে 'সিরাতে মুস্তাকীম' পাওয়ার সৌভাগ্য ঘটে, সেখানে শয়তানের ইবাদতের ফলে 'যাল্লিন' হওয়ার প্রতিফল নির্ধারিত হয়। উল্লেখিত সকল বিষয়ই উক্ত আয়াতগুলিতে যথাযথরূপে স্ব স্ব স্থানে রেখে দেয়া হয়েছে। যখন আপনারা ওগুলোকে উন্মোচিত করে পাঠ করেন, তখন ওগুলোতে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য দেখতে পান। ওগুলোতে রয়েছে ক্রমন্বয়তা ও গভীরতা এবং একটি বিষয় বুঝে নিলে অপরটি অবলীলায় বোধগম্য হতে আরম্ভ করে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আলোচ্য আয়াতগুলিতে অন্তর্নিহিত আরও কিছু বিষয় আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন: আমি কি তোমাদের কাছে বাধ্যকরভাবে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, "তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না? "ইন্নাহুলাকুম আদুউম মুবীন"—নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। প্রথমতঃ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, শয়তান সম্পর্কে একস্থলে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সে

প্রকাশ্য শত্রু। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে: "ইন্নাহু ইয়ারাকুম হুয়া ও কাবীলুহু মিন হাইসু লা তারাওনাহুম, ইন্না জায়ালনাশ্ শায়াতীনা আওলিয়া লিল্লাযীনা লা ইউমেনুন।" —শয়তান তো এরূপ যে, সে ঐ সব স্থান থেকে তোমাদেরকে লক্ষ্য করে তোমাদের উপর আক্রমণ চালায় যেখান থেকে তোমরা তাকে দেখতে পাও না। অতএব প্রশ্ন দাঁড়ায় প্রকাশ্য কী করে হলো? বস্তুতঃ শয়তান প্রকাশ্য দেখা যায় ওমনটি নয় তবে তার শত্রুতা অবশ্যই তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। এই হচ্ছে বিষয়-বস্তুটি। "আদুউম মুবীন" (—প্রকাশ্য শত্রু) হওয়া তার সপ্রমাণিত। যে-সব পথ হতে আল্লাহ্তা'লা তোমাদের বারণ করছেন, সে-সব পথে যখন যে-সব জাতি পরিচালিত হয় তখন অবধারিতভাবে তারা তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব আপনারা চিনতে পারুন কি না পারুন যে, কার আহ্বান বা প্রেরোচনায় তারা ঐসব পথে পরিচালিত হচ্ছিল, কিন্তু উহার কুফল তারা অবশ্যই দেখে নেয়। অতএব কোন স্ববিরোধ নেই, বরং বিষয়-বস্তুর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি রেখে পথ-নির্দেশনা দান করা হচ্ছে যে, শয়তানের প্রকাশ্য শত্রু হওয়া এইভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, যখনই আপনারা তাকে অনুসরণ করেন তৎক্ষণাৎ ঐ সব অনিষ্ট ও খারাপি দেখা দেয়। তবে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এই প্রকাশ্য শত্রুর পায়রবী কেন করেন? যখন কিনা আল্লাহ্ তা'লা বলছেন: "সে তোমাদেরকে সেখান থেকে দেখছে যেখানে তোমরা তাকে অবলোকন করতে পার না।" তাহলে তার কৌশলটা কী? যার দরুন তোমরা তাকে সনাক্ত করতে পার না। আল্লাহ্-তা'লা বলেছেন: 'ইন্না জায়ালনাশ্ শায়াতীনা আওলিয়া লিল্লাযীনা লা ইউমেনুন।' —শয়তান বন্ধু সেজে উপস্থিত হয়। আর যেহেতু সে বন্ধুর বেশে আসে, যার বন্ধুদের দলে তোমরা অন্তর্ভুক্ত, যাকে তোমরা নিজেদের বন্ধুরূপে দলভুক্ত করে নাও, সেজন্য তোমরা তাকে সনাক্ত করতে পার না। কাজেই শয়তান এবং শয়তানী চরিত্র বিশিষ্ট লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। এমতাবস্থায় তোমরা শয়তানের অনিষ্ট সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে না এবং সে তোমাদের উপর আক্রমণ করে বসবে। একটি বিষয় তো স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হলো যে, শয়তান যদিও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু শয়তানের বন্ধুরা তাদের কুকর্ম ও বদ স্বভাবের দরুন পরিদৃষ্ট হয়। যেহেতু সে তার বন্ধুদের মাঝে প্রকাশিত হয়, কাজেই তোমরা তার বন্ধুদের দলভুক্ত হয়ে পড়ার আগেই তার বন্ধুদেরকে চিনে নাও এবং তাদের নৈকট্য থেকে দূরে থাক। নিজেদের আসর ও মজলিসগুলোর হেফাযত কর। বদ-স্বভাব বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে যাও। খোদাতা'লার বিরুদ্ধে যারা বে-আদবি করে কটূকথা বলে তাদেরকে নিজেদের মধ্যে প্রবেশ করার কোনও সুযোগ দিবে না। এই শ্রেণীর লোকদের থেকে যদি তোমরা তৌবা করে নাও তাহলেই তোমরা খোদাতা'লার নিকটতর হতে পারবে। একবার কোন কলেজের এক ছাত্র হযরত

খলীফাতুল মসীহ আউওয়াল (রাঃ)-এর কাছে আবেদন করলো যে, তার অন্তরে নাস্তিকতার ধ্যান-ধারণার উদয় হয়। সেগুলোর মোকাবেলা করার শত চেষ্টা করেও সেগুলিকে সে দমাতে পারছে না। তিনি বললেন, তোমার সাথে নিশ্চয় এরূপ কোন সাথী বাস করে যে কিনা নাস্তিক। তুমি তার কাছ থেকে সরে যাও। কেননা, অনেক সময় সাথী-সঙ্গীরা কথা না বললেও তাদের অন্তরের ভাবনা-চিন্তা অন্যের অন্তরে অনুপ্রবেশ করে। নামাযে সঙ্গে দাঁড়ানো ব্যক্তি যদি অন্য কিছু ভাবতে থাকে, তাহলে মনোনিবেশ সহকারে যে নামায পড়ছে তার মনোযোগের উপরও প্রভাব পড়বে। এটা পরীক্ষিত সত্য। কোন হেয়ালি কথা নয়। যে মজলিসেই আপনারা একত্রে বসেন সেখানে ধ্যান-ধারণা একে অন্যের দিকে পরিবাহিত হতে থাকে। যদিও নির্দিষ্টরূপে বলা যায় না কার ভাবনা-চিন্তা কোন দিকে যাচ্ছে কিন্তু নীরবে মজলিসে বসা অবস্থায় সেখানে উপস্থিত লোকদের ধ্যান-ধারণা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একে অন্যের দিকে পরিবাহিত হতে থাকে। এবং দৃশ্যতঃ কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভাবনা-চিন্তার এই স্থানান্তরকে সপ্রমান করা যায় না। অতএব, শয়তানের সাহচর্য সরাসরি সনাক্ত করা না গেলেও তার বন্ধুদের মাধ্যমে তার পরিচয় ধরা পড়বে। যারা শয়তানের বন্ধু তারা তারই স্বভাব চরিত্রের রূপ ধারণ করে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে "আলা আন্না আওলিয়াল্লাহে"উল্লেখ করে ঐ সব ব্যক্তির গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যারা খোদাতা'লার বন্ধু। অতএব, আল্লাহ্‌র ওলীগণ পরিচিত হন তাদের গুণাবলীর দ্বারা। তাদের উঠা, বসা ভিন্নতর হয়ে যায় তাদের চাল-চলন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। আল্লাহ্‌র কোন ওলী এবং কোন দুশ্চরিত্র দুর্জন—এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য বুঝা না যায় এমনটি কখনও হতে পারে না। অতএব, 'আওলিয়া (বন্ধু) শব্দটিতে আল্লাহ্‌তা'লা শয়তানকে সনাক্ত করবার চাবি-কাঠি রেখে দিয়াছেন। তবে একদিকে বলেছেন যে, তাকে দেখা যায় না, অন্যদিকে বলছেন, তার থেকে আত্মরক্ষা করে চল। মানুষে বলবে, তাকে তো দেখাই যায় না। অতএব, কার থেকে কীভাবে বাঁচবো? তাই আল্লাহ বলছেন, সে তোমাদের বন্ধু সেজে আসবে। এবং শয়তানের বন্ধু স্বরূপ শয়তান যখনই যেকোন কথা বলবে তখনই তাতে তাকে চেনা যাবে। কেননা, বন্ধুর মধ্যে তার গুণাবলীর বহিপ্রর্কাশ ঘটে থাকে। আল্লাহ্‌র যারা বন্ধু, তাদের মাধ্যমে খোদাকে সনাক্ত তো করা যায়, কিন্তু তাদের সত্ত্বার মধ্যে খোদা স্বয়ং তো থাকেন না, কিন্তু তাঁর সিফাত বা গুণাবলীর বহি-প্রর্কাশ ঘটে। অতএব, শয়তানের বন্ধুদের মাঝে অবধারিতভাবে তার গুণাবলীর বহি: প্রর্কাশ ঘটে যায়। যেখানে তাকে দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত বস্তুতঃ সেখানেই সে পরিদৃষ্ট হয়। অতএব, এই শ্রেণীর লোকদেরকে পরিহার করা এবং তাদের ক্ষেত্রে নিজেদের সম্পর্কা-বলীর হিফাযত করা আবশ্যকীয়। তাদেরকে নিজেদের গৃহে প্রবেশ করতে দিবেন না এবং

তাদের গৃহেও আপনারা যাবেন না। যাদের কথা-বার্তায় আপনারা দীনের বিরুদ্ধে এতটুকুও গন্ধ পান, যাদের মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি সম্মান ও মর্যাদাবোধ নেই, ওসব লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসরও বসাবেন না। কুরআন করীম ওরূপ লোকদের মজলিস বা সভা-সম্মেলনের উল্লেখ করে বলেছে, যেখানে দীনের বিরুদ্ধে পরিহাস করা হয় সেখান থেকে তোমরা উঠে যাবে। আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা সেখানে আবারও গেলে তোমাদের অন্তর যদি এতটুকুও কলুষিত হয়, তাহলে সম্পূর্ণরূপে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। সাময়িক বিচ্ছেদের পর তারা যখন ভিন্ন প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলে, এমতাবস্থায় যদি তোমরা তাদের মাঝে গিয়ে বস এবং তোমরা দেখ যে, তাদের বদ স্বভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নি, যদ্দরুন তোমরাও প্রভাবিত হয়ে পড়বে বলে আশংকা বোধ কর, তাহলে তাদের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করা তোমাদের পক্ষে অপরিহার্য। নইলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে পড়বে। অতএব, আওলিউশ্-শায়াতীনকে সনাক্ত করার উপায় ও পন্থা কেবল আলোচ্য আয়াতটিতেই বর্ণনা করা হয় নি, বরং অন্যান্য আয়াতসমূহেও স্পষ্টাক্ষরে তুলে ধরা হয়েছে। নিজেদের সোসাইটির হিফাযত করুন। নিজেদের সন্তানদেরকে ওরূপ কলুষিত সোসাইটি থেকে রক্ষা করুন। নিজেদের স্ত্রীদেরকে রক্ষা করুন। স্ত্রীগণ স্বামীদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। যেন আমাদের সোসাইটি শয়তানের বন্ধুদের সাথে সম্পূর্ণ সংশ্রব-মুক্ত হয়। শয়তানের সাথে যেন আমাদের লেশমাত্রও সম্পর্ক না থাকে।

ইহা শয়তান থেকে বাঁচার একটি উপায় যা বলা হলো। এছাড়াও আরো উপায় আছে যা উক্ত আয়াতটি আমাদের শিখিয়েছে। (যেমন) রাব্বুল আলামীন হচ্ছেন আল্লাহ্-তা'লা। যখনই কোন ব্যক্তি খোদাতা'লার রবুবীয়্যতকে পরিত্যাগ করে, গয়ের-আল্লাহ্কে প্রতিপালক-প্রভু বলে মনে করে, তখনই সে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত রবুবিয়্যতের সকল শর্তকে উপেক্ষা করে বসে। বস্তুতঃ শয়তানের ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সব চে' বড় প্ররোচনাদায়ক কারণ হচ্ছে রবুবীয়্যত। দুনিয়া-জাহানে বড়ো বড়ো ফেৎনা হচ্ছে অর্থ-নৈতিক ফেৎনা। বড়ো বড়ো যে-সব জাতি দুনিয়া জুড়ে বে-ইনসাফি করে থাকে এবং অন্যান্য জাতির উপর-যুলুম-অত্যাচার করে তারা নিজস্ব সত্তায় প্রায়শঃ অত্যন্ত সভ্য হয়ে থাকে। ঐ সকল রাজনীতিক যারা বিভিন্ন দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে, যারা তাদের হাতছাড়া হয়, অন্যায়ভাবে অর্থনৈতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা নিজেদের নিত্যকার ব্যাপারে অত্যন্ত নম্র-ভদ্র, শালীন ও মিষ্টভাষী হয়ে থাকে। তাদের দেখে মানুষ বিস্ময়াবিভূত হয় যে, কত মার্জিত লোক! কিন্তু যেখানে রবুবীয়্যতের ব্যাপার আসে সে ক্ষেত্রে শয়তানকে তাদের রব্ব্ হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া এতো প্রকটভাবে সামনে ভেসে উঠে যে কোনও দর্শকের পক্ষে লেশমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দুনিয়া জুড়ে

সমস্ত বড় বড় জাতির দিকে তাকিয়ে দেখুন, তারা নিজেদের মাহাত্ম্যের, নিজেদের কৃষ্টি ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্বের এবং নিজেদের উচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গালভরা দাবী জানায় কিন্তু যেখানেই রবুবীয়্যতের প্রশ্ন আসে সেখানে তারা শয়তানের সম্মুখে মাথা নত করে দেয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাদের কাছে যা প্রত্যাশা করেন, সেজন্য তারা তখন বিন্দুমাত্রও পরোয়া করে না। জাতির নেতৃবর্গ যখন রবুবীয়্যত অর্থাৎ রিয্কের ব্যাপারে নিজের জাতির স্বার্থের উপর অন্যান্য জাতির স্বার্থকে এজন্য প্রাধান্য দেয় যে, এটাই আল্লাহ্র প্রত্যাশা, তখন ওরূপ নেতাদেরকে তাদের অবস্থানে থাকতেই দেয়া হবে না। কেননা, গোটা জাতিই শয়তানের বান্দা বা দাসে পরিণত হয়ে গেছে। সাধারণভাবেই মানুষের ঐ একই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ্তা'লা বলেন, তোমরা দাবী করে থাক আমার ইবাদত করার এবং প্রত্যাশা কর যেন প্রতিদানে উহার উপকার তোমাদের দান করি। কিন্তু, তোমাদের প্রত্যেকটি কর্ম হচ্ছে শয়তানের ইবাদতের ছাঁচে ঢালা এবং তোমরা তার মূর্তিমান বান্দায় পরিণত। এমতে একই সময় যুগপৎ বিপরীতমুখী দু'টি ব্যাপার কী করে সম্ভব!? একই সময়ে দু'টি (বিপক্ষীয়) সরকারের সামনে মাথা নত করা যায় না। হয়তো এটাকে করবে, নয়তো ওটাকে। অতএব ইবাদতের বিষয়-বস্তু শির্কের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আল্লাহ্তা'লা বলছেন, শিরক্ থেকে তৌবা করা ব্যতিরেকে তোমরা ইবাদুল্লাহ্-এর সাড়িতে প্রবেশই করতে পার না, তোমাদের দোয়া কবুল হবে না। এদিক দিয়ে আপনারা যদি "ই-ইয়াকা না'বুদু" শব্দগুচ্ছ পুনরাবৃত্তি করে লক্ষ্য করেন, তাহলে অধিকতর মহান বিষয়-বস্তু আপনাদের দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হবে। যখন আপনারা বলেন, "ই-ইয়াকা না'বুদু ওয়া ই-ইয়াকা নাস্তাঈন"—তখন প্রথমতঃ এতে রয়েছে বিনয়ের বহিপ্রর্কাশ, এই বলে যে, আমরা তোমার ইবাদত করতে চাই, কিন্তু তোমার যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য তুমি তুলে ধরেছ, যদি কেউ পরম অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্বাসের সাথে সেগুলোকে সত্য বলে মেনে নেয় তাহলে আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়া তার পক্ষে আর উপায়ই থাকলো না। বস্তুতঃ "ই-ইয়াকা না'বুদু"-বলতে ইহা আল্লাহ্তা'লার উপর কোন ইহ্সান বা অনুগ্রহ নয় এই বলে যে, আমরা ফয়সালা করছি, তোমার ইবাদত করার। এটা বলার একটি ভঙ্গী এই মর্মে যে, হে আল্লাহ্! তুমিতো আর কিছুই অবশিষ্ট রাখ নাই যার ভিত্তিতে তোমার ইবাদত আমরা না করেও পারি। যখন প্রতিপালক-প্রভুও তুমিই, অযাচিত অসীমদাতা তুমিই এবং রহীম ও মালেকও তুমিই, তখন আমরা কি পাগল হয়ে গেলাম, ইবাদতের জন্য অন্য কারো দিকে ঝুঁকবো?! (ইবাদতের জন্য) অন্য কেউ-ই তো থাকলো না। "ই-ইয়াকা'-তে "ই-ইয়া" শব্দটি যে "লা ইলাহা" এর মতই মাবূদস্বরূপ অন্য সবকিছুকে অস্বীকার করাকে বুঝায়, ইহা পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। ইহা যতই পরিপূর্ণ হবে, ততই "ই-ইয়াকা নাস্তাঈন"-এর দোয়া কবুল হবে। এ লক্ষ্যটি উপলব্ধি না করে আপনারা যখন দোয়া করেন—অনেক সময় বুঝাতেই পারেন না এতো

দোয়া করা সত্ত্বেও কেন কবুল হচ্ছে না। আপনারা বলেন, "হে খোদা! আমরা তোমার ইবাদত করতে চাই, "ওয়া ই-ইয়াকা নাস্তাঈন"—(এবং তোমার কাছে সাহায্য চাই) কিন্তু ওদিক থেকে জওয়াব পাই না।" যেহেতু সারা জীবনের এই ইবাদতসমূহ গয়ের-আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত থাকে সেজন্যই ফলপ্রসূ হয় না, বিফলে যায়। কেননা, তাদের আমলী (ব্যবহারিক) জীবন শয়তানের ইবাদতে লিপ্ত থাকে। বাস্তব ঘটনার নিরিখে তাদের রিযিক গয়ের-আল্লাহ্‌-এর কাছ থেকে অর্জন করা হয় এই অর্থে যে, যদিও সব রিযিক আল্লাহ্‌ কর্তৃকই প্রদত্ত কিন্তু আল্লাহ্‌র আহকামের অবাধ্য হয়ে উপার্জনের ঐসব উপায় তারা অবলম্বন করে যা খোদাতা'লার দৃষ্টিতে জায়েয নয়। যেখানেই এ ব্যাপারটি ঘটে যে, যখনই সংকটাবস্থায় পড়ে কেউ সিদ্ধান্ত নেয় যে, "আল্লাহ্‌র পসন্দ হোক বা না হোক তাতে আমার যায় আসে না, যেখান থেকে আমার রিযিক পাওয়া যাচ্ছে সেখান থেকে নিশ্চয় আমি তা লাভ করবো", ওরূপ করার দরুন তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্‌র রবুবীয়্যতের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। যখন সে নামায আদায় করবে, তাতে নামাযের স্বাদ আসতেই পারে না। সে বড়ই ধোঁকা-গ্রস্থ এই ভেবে যে, সে তো অনেক বারই বলতে থাকে "ই-ইয়াকা না'বুদু ওয়া ই-ইয়াকা নাস্তাঈন" কিন্তু খোদা সাহায্যই করেন না। এই জন্যই করেন না যে, তুমি সত্যের এই গুঁঢ়তত্বটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছো যে "ই-ইয়াকা না'বুদু" উচ্চারণে যে কার্যতঃ সত্যনিষ্ঠ হয়, কেবল তার পক্ষেই "ই-ইয়াকা নাস্তাঈন"-এর দোয়া অবধারিতভাবে কবুল হয়। উল্লেখিত বিষয়-বস্তুটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবতঃ এতো ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রযোজ্য যে, সে দিকে তাকালে মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে।

যে ক্ষেত্রেই মানুষ সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদত করে থাকে, তা রবুবীয়্যত সম্পর্কিত হোক কিম্বা রাহমানীয়্যত বা রহীমিয়্যত অথবা মালেকীয়্যত সম্পর্কিত হোক—যেখানেই সে সত্য ও যথার্থ সাব্যস্ত হয় সেখানেই তার পক্ষে "ই-ইয়াকানাস্তাইন" জেগে উঠে বাস্তবরূপ ধারণ করে। ওরূপ সব ব্যাপারেই আল্লাহ্‌ অবশ্য-অবশ্যই সাহায্য করেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'খোদাতা'লার যে-সব বান্দা তাঁর বান্দাদের সাহায্য-সহায়তায় চেষ্টারত থাকে আল্লাহ্‌তা'লা তাদের সাহায্য-সহায়তাকে নিজের উপর বাধ্যকর করে থাকেন।' তারা আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করছে, আল্লাহ্‌ তাদের সাহায্য করছেন। তারা মুখ দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করুক বা না করুক, উক্ত ঐশী-ক্রিয়া অবলীলায় কার্যকর হয়ে পড়ে। এ সেই বিষয়-বস্তু, যা রহমানীয়্যতের সাথে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর উপর পরবর্তীতে কখনও সবিস্তারে আলোকপাত করবো। রাহমানীয়্যতের দ্বারা আল্লাহ বুঝিয়েছেন যে, তিনি না চাইতে দানকারী। পক্ষান্তরে

'ই-ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকানাস্তাঈন'—দোয়াটি বলছে যে, চাও। দৃশ্যতঃ উক্ত বিষয় দু'টিতে পরস্পর বিরোধ কেন? এর একটি নিষ্পত্তি হচ্ছে উহা, যা আমি বর্ণনা করছি। আপনারা নিজেদের আমলী বা ব্যবহারিক জীবনের যেখানে-যেখানে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক যুক্ত করেন, সেখানে তিনি না চাইতেও দান করেন। ওসব ক্ষেত্রে রহমান হিসেবে উদ্ভাসিত হন। আর যেখানে তাঁর সাথে (তাঁর না-ফরমানীর দ্বারা) আপনারা সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেন, সেখানেও যখন দান করেন; হাঁ, তবুও তিনি দেন—তখন রহমান হিসাবে নয় বরং রহীম হিসাবে দেন। কেননা, কেউ চাইলে তিনি তাকে দান করেন। তার জন্য সেই উচ্চস্তরের শর্ত নেই, যা আল্লাহ্তা'লা অন্য ক্ষেত্রে ন্যাস্ত করেছেন। (যেমন,) কোনও মুশরেক সম্বন্ধে তিনি জানেন (বিপদে পড়ে আপাততঃ সাহায্য চাইলেও) সে পুনরায় শিরক করবে। ঠেকে গিয়ে বলছে, 'হে খোদা! তোমার সাহায্য চাইছি।' অন্য কোনও সাহায্য পাওয়ার আশা নেই বলে সাহায্য প্রার্থী হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, যদিও তার পক্ষে সাহায্য চাওয়া সমীচীন নয় তবুও তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে তিনি সাহায্য করেন। এটা হচ্ছে তাঁর রহীমিয়্যত গুণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়, অর্থাৎ চাওয়ার দরুন অনুগ্রহ করেন। এবং রাহমানীয়্যত সম্পর্কিত বিষয়েও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অন্যান্য হাদীসাবলী এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাবলীও বিশদভাবে আলোকসম্পাত করছে যে, যারা 'ইবাদুর রহমান' হয়ে যায়, তারা নিদ্রাভিভূত হলেও আল্লাহ্ তাদের জন্য জাগ্রত থাকেন। তারা নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে অসচেতন থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের স্বার্থের বিষয়ে সচেতন থাকেন এবং তা সুরক্ষা করেন। ঘুণাক্ষরেও তারা জানে না যে, দুশমন কী সব ষড়যন্ত্র করছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজে উদ্যোগী হয়ে দুশমনের প্রত্যেক ষড়যন্ত্রকে আক্রমণের রূপ ধারণ করার আগেই নস্যাৎ করে দেন। অতএব, রহমানীয়্যত ও রহীমিয়্যত উভয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিকাশ ঘটায়। কোথাও 'না চাওয়া' খোদার নিকটবর্তী করে দেয়। আবার কোথাও 'চাওয়া' নিকটবর্তী করে দেয়। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মহান সত্তায় উভয় জ্যোতির্বিকাশ বিস্ময়াতীত স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান রূপে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু পূর্বেই বলেছি—ইহা যেহেতু একটি স্বতন্ত্র বিষয়-বস্তু, সেহেতু এর উপর পরবর্তী কোন খোৎবায় পৃথকভাবে সবিস্তারে আলোকপাত করবো।

এখন আমি এই বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি যে, শয়তানের ইবাদতের পরিচয় লাভের উপায় কী। প্রথমে আপনারা নিজেদের রবুবীয়্যতের (ক্ষেত্রে ইবাদতের) সংরক্ষণ করুন। নিজেদের রিয্কের আকাঙ্খা, ধন-সম্পদের বাসনা ও সহায়-সম্পত্তির অভিলাষ—এসবই রবুবীয়্যতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। এসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন এবং উহার হিফাযত করুন। যেখানে

যেখানে আপনারা নিজেদেরকে গয়ের-আল্লাহ্‌র রবুবীয়্যতের বাঁধন ছাড়িয়ে আল্লাহ্‌র রবুবীয়্যতের ছায়াতলে আশ্রয় নিবেন সেখানেই আপনারা অবধারিতভাবে আল্লাহ্‌তা'লার এরূপ ইবাদতের সৌভাগ্য লাভ করবেন যে, প্রত্যেক ইবাদতের দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লার রবুবীয়্যতের জ্যোতির্বিকাশ আগের চেয়ে উজ্জলতর হবে, এবং "ই-ইয়াকানাবুহু"-এর ফলশ্রুতিতে "ই-ইয়াকানাস্তাঈন"-এর বিষয়-বস্তু এক প্রাকৃতিক নিয়মের ধারায় জারী হবে। কোনও প্রতিবন্ধকতা এ পথে আর আসতে পারে না। বস্তুতঃ সবচে' বড়ো ফেৎনা হচ্ছে রবুবীয়্যতের ফেৎনা, অর্থাৎ গয়ের-আল্লাহ্‌কে রব্ব্‌ (—প্রতিপালক-প্রভু) হিসেবে গ্রহণ করা। তাই আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেইনি যে শয়তানকে তোমরা তোমাদের রব্ব্‌ (—প্রতিপালক-প্রভু) বানাবে না। তার ইবাদত না করার নির্দেশটি এ অর্থই বহন করে। কিন্তু তোমরা তাকে নিজেদের 'রব্ব' বানিয়ে বসেছ। আর যখন বানিয়ে বসেছ তখন তোমাদের গোটা সমাজ দুঃখে-কষ্টে ভরে গেছে। ইহা শয়তানের সেই "আদউম মুবীন" (—প্রকাশ্য শত্রু) হবার বিষয়-বস্তু। দুনিয়াতে যত রকমের সমস্যা ও বিপদ-আপদ দেখা যায় ওসবের প্রধান কারণ রিয্‌ক অর্থাৎ সম্পদ আহরণের উন্মাদসুলভ আকাঙ্খা (বা লিপ্সা), যা এরপর কোনও নৈতিক মূল্যবোধকে স্বীয় পথে বাধাস্বরূপ হতে দেয় না। এটা হচ্ছে আসলে রিয্‌ক আহরণের লিপ্সা। সে শয়তানকে রব্ব্‌ বানালো। আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, তা করো না। সে বললো, আমি তো যেভাবেই হোক রিয্‌ক আহরণ করবো। সে যখন কোন অপর ব্যক্তির দুয়ার ভেঙ্গে প্রবেশ করে সে বস্তুতঃ পক্ষে শয়তানের দুয়ার ভেঙ্গে তার গৃহে ঢুকে পড়ে। অর্থাৎ তার আত্মার দিক দিয়ে সে আসলে শয়তানকে আপন করে নেয়। আর এই লিপ্সা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই মানবসমাজ যুলুম-অত্যাচারে ভরে যেতে থাকে। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হয় ডাকাতি। যদি গৃহ-স্বামী দেখে ফেলে তাহলে সে তাকে চিনে ফেললো কি-না সে ভয় তাকে প্ররোচিত করে গৃহবাসীকে হত্যা করার জন্যে। তারপর এই যুলুমের যখন মাত্রাবৃদ্ধি হয় তখন রাস্তা-ঘাটও আর নিরাপদ থাকে না। মানুষের এমনটিও হয়ে থাকে কোন কোন মানবসমাজে, যেমন আমেরিকায় ওয়াশিংটন, নিউয়র্ক ইত্যাদিতে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাস্বরূপ অহরহ ঘটে থাকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন মহিলা হাতে তার অত্যন্ত দামী ঘড়ি অথবা সোনার বালা পরে আছে, পাশে দিয়ে কোন সন্ত্রাসী অস্ত্র চালিয়ে দেয়। তাতে হাতও কেটে যায় এবং বালাও মাটিতে খসে পড়ে। ওটা তুলে নিয়ে সে ভেগে যায়। একটি কড়া বা ঘড়ির জন্য হাত কেটে ফেলতে তারা কোনও পাপ মনে করে না। কাজেই, "প্রকাশ্য শত্রু" হলো কিনা শয়তান? মানব সমাজকে যে এরূপ ভয়াবহ অন্যায়-অনাচারে ভরে দেয়, সে তোমাদের বন্ধু কী করে হলো?! আর এসব যুলুম যখন ছড়ায় তখন যত্রতত্র চুরি, ডাকাতি আর এর ফলে লুটতরাজ, রাহাজানি—পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে

পথচারীর সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া, এছাড়া অন্যান্য যত রকমের অত্যাচার সংঘটিত হয়, তা সকলই দৃশ্যতঃ দেখতে পায়। আর সেজন্য সমাজের সবাই আর্তচিৎকারে বলে ওঠে যে, ভয়ঙ্কর অত্যাচারী! অথচ সে সমাজেই শয়তানের ঐ বন্ধুরা বাস করছে, যারা শয়তানী স্বভাব-চরিত্র ধারণ করার দরুন সমাজকে দুঃখে-কষ্টে ভারাক্রান্ত করে তুলছে। আবার প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে ঐ একই স্তরে এসে যদি কিছু লাভ করতে পারে তাহলে সে-ও ধোঁকা ইত্যাদি সব রকম অসদুপায় অবলম্বনে মোটেই দ্বিধা করবে না, যদিও তাকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য আদালতগুলিতে টাকা দিয়ে তার পক্ষে মিথ্যা রায় নিতে হয় অথবা শিশু অপরণের মাধ্যমে রায় আদায় করতে হয়। বস্তুতঃ প্রত্যেক ধরনের অনাচার-অত্যাচার শয়তানের (স্বভাব-চরিত্রের) সাথে বন্ধুত্বেরই প্রকাশস্থল স্বরূপ। আর যখন গোটা সমাজ শয়তানের আওলিয়া বা বন্ধু হয়ে যায়, তখন সেখান থেকে মঙ্গলের আর কি বা আশা থাকতে পারে?

বস্তুতঃ রবুবীয়্যতের বিষয়-বস্তুটিই সবচে' বেশী গুরুত্ব রাখে এবং সবচে' ব্যাপক আকারে মানব-জীবনে বিস্তৃতি লাভ করে আছে। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল দেশ এতে আপাদ-মস্তক লিপ্ত হয়ে আছে। যেন সকল মানুষ এতে জড়িয়ে আছে। এহেন অবস্থায় যদি আহমদীরাও এতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে এই মানুষেরা রক্ষা পাবে কী করে? এ সেই প্রশ্ন, যা আমি উঠাতে চাই। এমতাবস্থায় যাদের কাছে অবক্ষয় থেকে বাঁচার প্রত্যাশায় যারা আসবে তারা এসে দেখবে এরা তো তাদের চেয়েও দুর্দশাগ্রস্থ। অতএব, আপনাদের উপর তখন প্রযোজ্য হবে কবি গালেবের কবিতার এ পংক্তি দুটো:

"জিন সে হামকো তাওয়াক্কো থি নেজাত কি
উওহ্ তো হাম সে ভী যিয়াদা খাস্তা নিকলে।।

(—যাদের কাছে আশা ছিল যে, দারিদ্রের কষাঘাত থেকে তারা আমাদের মুক্তি দিবে, তাদের অবস্থা তো আমাদের চেয়েও খারাপ দেখা যায়)

দুনিয়া তখন তোমাদের বলবে, 'তোমাদের দিকে চেয়ে আমরা আশা করে বসেছিলাম যে, তোমরা আমাদেরকে রক্ষা করবে, তোমরা তো নিজেরা গয়ের-আল্লাহ্‌র ইবাদত করছো! তোমাদের নিজেদের রিয্‌কই যখন পাক-পবিত্র থাকলো না, তখন মানবজাতির রিয্‌ক কী করে পাক-পবিত্র করবে? আপনাদেরও অনুরূপ অবস্থা হলে আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের জন্য 'রব্ব্' (প্রতিপালক-প্রভু) স্বরূপই বা কী করে হবেন? এ-তো হতেই পারে না যে, শয়তানকে আপনারা রব্ব্ হিসাবে গ্রহণ করবেন, আর আল্লাহ্ আপনাদের রব্ব্ হয়ে যাবেন! আর আল্লাহ্ যদি রব্ব্ না হন তাহলে কোন কিছুই আর অবশিষ্ট থেকে যায় না। তাহলে সব কেস্‌সাই খতম। এই দুনিয়াকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, তোমরা হচ্ছো খোদাতা'লার আখেরী জামাত। যদি তোমরা রক্ষা না কর, তাহলে রক্ষা কল্পে কেউ আসবে না। এতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে হৃদয়ঙ্গম না করার দরুনই আপনারা দৈনন্দিন জীবনে এসব ব্যাপারাদিতে এতো কলুষলিপ্ত হয়ে থাকেন যে এমন কোনও দিন

যায় না যেদিন এই মর্মে আমার কাছে চিঠি আসে না যে, অমুক আমাকে এ বলেছিল ; এতো টাকা নিয়ে ভেগে গেছে—, এতো টাকা আত্মসাৎ করেছে, অমুক অস্বীকারই করে বসেছে যে সে টাকা নিয়েছিল ; কেউ বলেছিল, এতো টাকা দাও, আমি তোমাকে অমুক দেশে পৌঁছাবো, আমরা তাকে তালাশ করে দেখি, সে নিজেই ঐ দেশে পৌঁছে গেছে। সেখানে গিয়ে বসে আছে।" এরূপ যুলুম-অত্যাচারপূর্ণ অন্যায়-অনাচার ঘটিয়ে যদি ওরূপ ব্যক্তিদের দাবী হয় যে, তারা 'ই-ইয়াকানা'বুহু ওয়া ই-ইয়াকানাস্তাঈন' বলে দোয়াও করে—এ শ্রেণীর লোকদের অনেকে আবার নামাযও পড়ে—তবে তারা কার এই ইবাদত করছে?! তাহলে তো তারা সাহায্যও তার (অর্থাৎ শয়তানের) কাছেই প্রার্থনা করুক। কেননা, "ইয়াকা না' বুহু" তো শর্ত আরোপ করে দিয়েছে যে, "আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং সাহায্যের জন্য তোমারই দুয়ারে করাঘাত করছি।" যদি ইবাদত অন্য কারো করে যাচ্ছে, তাহলে আওয়ায আসবে, হে অভিশপ্ত ব্যক্তি ! দূর হও আমার সম্মুখ থেকে। যার দরজায় তোমার অন্তকরণ কড়া নাড়াচ্ছে, সে-ই তোমার মাবুদ (উপাস্য)। তারই কাছে গিয়ে সাহায্য চাও। অতএব, দোয়া কবুল হওয়ার রহস্য আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত বাক্যটিতে উন্মোচিত করেছেন। কত স্পষ্টাক্ষরে বিষয়টি বোধগম্য হয়ে পড়ে। অতএব, আল্লাহ্‌তা'লার সাথে আপনারা নিজেদের সম্পর্ক সঠিক করুন। নিজেদের ইবাদতের মুখ ওদিকে ফিরান। এবং তা ততোক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা শয়তানের ইবাদত থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকেন, সর্বতঃ আত্মরক্ষা করেন। ইহা এমন কোনও বিষয় নয়, যা বোধগম্য হতে পারে না। বস্তুতঃ পরিষ্কারভাবেই বোধগম্য হয়ে গেছে। তারপরও যদি স্খলিত হন, তাহলে এ আয়াতটিই আপনাদের কাজে আসবে। কিন্তু তখন অন্তরে আর এক মর্মবেদনা সৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন। ধরুন, কোন ব্যক্তি দুর্নীতি ও অসততায় লিপ্ত, কুঅভ্যাসে জর্জরিত, বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিপথগামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবু এ-সবকিছু থেকেই সে তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায়। কিন্তু তার সাধ্যে কুলোয় না। এমতাবস্থায়, এ দোয়াটিই এক ভিন্নমর্মে কাজে আসে : "ই-ইয়াকানা'বুহু ওয়া ই-ইয়াকানাস্তাঈন—হে খোদা ! ইবাদত আমরা তোমারই করতে চাই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে শয়তানের। সেজন্য তোমার সাহায্য ভিক্ষা করছি। এমন কিছু একটা কর আমাদের জন্য, যাতে তোমার —কেবল তোমারই ইবাদতের সৌভাগ্য লাভ হয়।" যখন অন্তরে দরদ সৃষ্টি হয় এবং উক্ত মর্মে এই দোয়া করা হয়, তখন উহার সুপ্রভাব আপনারা অবশ্যই দেখতে পাবেন, যা নিশ্চয় প্রতিফলিত হবে। আল্লাহ্‌তা'লা তো প্রত্যেক যে প্রত্যাশাই তাঁর বান্দাদের কাছে রেখেছেন, তা সবদিক খোলাসা ক'রে ব্যক্ত করেছেন এইবলে যে, এই উপায় অবলম্বন কর ; তাহলে আমার পথে পদচারণা তোমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন ঠেকবে না। বরং সহজতর হতে

থাকবে। "ওয়া আনে'বুদ্‌নী, হাযা সিরাতুস্‌ মুস্তাকীম"—সোজা-সরল বিষয় যে আমার ইবাদত কর। তাহলে সরল-সত্য-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত হয়ে পড়বে। সেখানে কোন আশংকা নেই, কোনও ডাকাতি নেই, কোন চোর-চোট্টা সেখানে ভিড়তে পারে না। উন্নতি করার জন্য রয়েছে সেই রাস্তা, যা 'আন্‌আমতা'-এর সনদপ্রাপ্ত।—"সেই লোকদের পথ, যাদের ওপর তুমি নেয়ামতসমূহ বর্ষিত করেছ।" প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মাথা উঁচু করার উদ্দেশ্যে, বা সব রকম নেয়ামত লাভ করার জন্যে, রিয্‌কের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়া চষে বেড়ায়। হন্যে হয়ে ছুটে বেড়িয়ে হয়রান হতে থাকে। অথচ যা সবচে' সহজ-সোজা রাস্তা আল্লাহ্‌তা'লা বুঝিয়ে দিয়েছেন ওটিতে পরিচালিত হয়ে দেখে না। এজন্যে যে, একীনের অভার রয়েছে। বস্তুতঃ যদি একীনের অভাব থাকে তাহলে যার ওপর একীন বেশী থাকবে, তারই ইবাদত হবে এবং যার ওপর একীন কম হবে, তাঁর হবে না। অতএব, এটা শির্‌কের মাপকাঠি সাব্যস্ত হলো। কাজেই আল্লাহ্‌তা'লার ওপর কতটুক একীন আছে তা জানতে হলে নিজেদের দৈনন্দিন প্রতিক্রিয়া থেকে নিশ্চিৎ জানতে পারেন। হতেই পারে না যে, এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

এরপর রয়েছে রহমানীয়াতের বিষয়-বস্তু। আপনারা যখনই মানব সমাজে বড়ো লোকদের 'রহমান' বলে ভাবেন তখন সংকটে পড়লেই তাদের দোরগোড়ায় গিয়ে 'রহমান! রহমান!' বলে ডাকেন। তাদের সাথে সে-ভাবে সম্পর্ক রাখেন যেভাবে রহমান খোদার সাথে বান্দাদের সম্পর্ক অথবা বান্দাদের সাথে রহমানের সম্পর্ক হয়ে থাকে। 'না চাইতে দান' করার বিষয়-বস্তুই এখানে হুবহু প্রযোজ্য হয়। সুতরাং অনেকে বড়ো লোকদের কাছে গিয়ে কোন কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যেই তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে না, বরং তাদের সাথে শুধু সম্পর্ক-সংশ্রব রাখার মাঝে, অযাচিত দানের ফায়দা লাভের মতলবটা তাদের সামনে থাকে। তারা জানে, এ সম্পর্কটা এধরনের, যদ্দরুন তাদের ফায়দা হবেই হবে। যেমন, কেউ যদি রাজার মুসাহেব হয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়ায়, বড়ো লোকদের সংস্পর্শে থাকে, তাদের দোরগোড়ায় তার হাজিরা থাকে, তাহলে আশ-পাশের আনুসঙ্গিক উপকারগুলো সে অবলীলায় লাভ করতে থাকবে। জরুরী নয় যে, সরাসরি তাদের কাছে কোন-কিছু তাকে চাইতেই হবে। আজকাল যেমন নেওয়াজ শরীফ সাহেবের বাস-ভবনের ভেতরে-বাইরে কে কে আসা-যাওয়া করে অথবা আগে যেমন ভুট্টো সাহেবের প্রাসাদে যারা যাতায়াত করতো, তাদের প্রতি অন্যদের লক্ষ্য রাখাটাই ওদের জন্য যথেষ্ট। এ ধরনের লোকের চিঠি-চিরকুট তখন মুচলাকার ন্যায় যত্র-তত্র কার্যকর হয়। একবার অনুসন্ধানে সত্যি-সত্যি অনুরূপ ব্যাপারই সামনে আসলো যে, যে-সব ব্যক্তিকে সরকারের খুব ঘনিষ্ঠজন বলে মনে করা হয়েছে তারা এটাও বলতো না যে, অমুক কর্তা-ব্যক্তি তাদের এটা বা ওটা করতে বলেছেন,

অথবা অমুকের দিক থেকে তাদের কাছে ফরমান এসেছে। বরং ঐ ব্যক্তি নিজেই দু'কথা বসিয়ে দিতো যে, এ কাজ করতে হবে। আর তাতেই কাজ হয়ে যেতো। বড়ো বড়ো কর্ম-কর্তাদের সাধ্য ছিল না তাদের আদেশ অমান্য করার, ইহা জানা সত্ত্বেও যে, তারা হচ্ছে অমুকের বন্ধু বা সেখানে তাদের যাতায়াত আছে মাত্র। অতএব, ওরা তাদের রহমানে পর্যবসিত হয় এই অর্থে যে, কোন কিছু না চাইতেই দানকারী সাব্যস্ত হয় তাদের জন্য। বরং তারা যদি কখনও কিছু চেয়ে বসে তাহলে ওদের দরবারে তা প্রত্যাখ্যাতই হবে। কাজেই, মানুষ যদি রহমান হিসেবে ভাবে অন্য কাউকে এবং বাহ্যতঃ সম্পর্ক রাখে আল্লাহ্‌র সাথে, তাহলে সে আসলে অন্যকে বলে যে, হে রহমান! তোমার মহান এই গুণটি আমার হৃদয়কে এতো আকর্ষণ করেছে যে, এখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমায় বলি: ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকানাস্তাঈন !!" অতএব, রবুবীয়্যতের আকর্ষণ যেমন স্বস্থানে কাজ করে, তেমনি রহমানীয়্যতের আকর্ষণও। তাছাড়া গোনাহ্-খাতা থেকে ক্ষমা লাভের ক্ষেত্রেও 'রহমানীয়্যত' কাজ করে। যেখানেই মানুষ ঠেকে যায়, সেখানেই ওরূপ মানুষের রহমান বদলে যায়। আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হওয়ার পরিবর্তে প্রথমেই তার খেয়াল যায় তার বন্ধুদের দিকে, তার সম্পর্কের অন্যান্য লোকদের দিকে— ঐ সংকটের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকের সম্বন্ধে চিন্তা করে যাতে তাদের সকাশে দয়াপ্রার্থী হতে পারে। মনে করে, তাদের দান-দক্ষিণা ব্যতিরেকে পার পাওয়া যাবে না। অন্য কথায়, সে ভাবে যে তারা যদি তাকে তাদের কোলে তুলে নেয় তাহলেই ক্ষমা বা রক্ষা পাবে। প্রকৃতপক্ষে এই নির্ভরশীলতা ও তওয়াক্কুল কার উপরে? এটাই হচ্ছে আসল কথা। যদি তওয়াক্কুল গয়ের-আল্লাহ্‌র উপর ন্যাস্ত হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা সম্পূর্ণ নিরর্থক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুগির সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ডিম পাড়ে কোনও একখানে, আর মলত্যাগ করে অন্য কোথাও। অতএব দীনকে যদি আপনারা মল দিয়ে ভরে দেন আর ডিম পাড়েন অন্যান্য গৃহে এবং ঠেকে গিয়ে প্রয়োজনের সময় ডিম চান গিয়ে বিষ্ঠার স্থানে, তবে তা কী ক'রে সম্ভব? রহমানের সাথে যাদ সম্পর্ক রাখতে চান তাহলে পবিত্রতার এবং দয়া-দাক্ষিণ্য লাভের জন্য সে সম্পর্ক এভাবে রাখুন যে, আল্লাহ্‌তা'লার রাহমানীয়্যতের মোকাবেলায় যেন অন্য কারও রাহমানীয়্যতকে হৃদয়ে স্থান না দেন। প্রত্যেক সংকটে প্রত্যেক বিপদকালে প্রথমেই যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় দোয়ার উপরে। আর এরূপে মানুষ তার আত্মপরিচয় লাভ করতে পারে। যাদ প্রথম খেয়াল অন্যদের প্রতি নিবদ্ধ হয়, আর সেই সাথে দোয়াও চায় এবং অন্যকে বলে যে, আপনি আমার কাজটা করিয়ে দিন, তাহলে এটা সর্বৈব মিথ্যা-বানোয়াট ভূমিকা। যাদও এটি একটি জটিল বিষয়-বস্তু, যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এপথের সংকট ও আশংকাবলী স্পষ্টভাবে উন্মোচিত করে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাওয়াক্কুল আল্লাহ্‌র

উপর করো, তাঁর রাহ্‌মানীয়াতের উপর তওয়াক্কুল করো—এর অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার উপায়-উপকরণ যা খোদাতা'লাই সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে আপনারা মুখ ফিরিয়ে নিবেন। কাজেই সেসব উপায়-উপকরণ তো অবলম্বন করতে হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও রব্ব্‌ এবং রহমান হিসেবে খোদাকেই হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা এই বাস্তব মৌল-তত্ত্বটিকে অনুধাবন করেন ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের রব্ব্‌ ও রহ্‌মান খোদার সাথে আপনাদের সম্পর্ক সঠিক (বলে সাব্যস্ত) হতেই পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার যে-সব সম্পর্ক ও পার্থিব উপকরণ রয়েছে, সেগুলো গৌণ ও নিম্নতন ? না, খোদার কাছে যে দয়া ও সাহায্য লাভের আশা-প্রত্যাশা, সেটা গৌণ ও নিম্নতন ? সূক্ষ্ম এই সিদ্ধান্তটি মানুষ নিজস্বভাবে গ্রহণ করতে পারে। কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। যদি কোথাও পার্থিব উপায়-উপকরণ এজন্য অবলম্বন করেন যে, তা করার আল্লাহ্‌র আদেশ রয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন ধারায় দৃঢ়বিশ্বাস রাখেন যে, এ-সব উপায়-উপকরণ যতোক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ তা'লা চাইবেন, ফলপ্রসূ হতেই পারে না। এমতাবস্থায় ওসব উপায়-উপকরণের ব্যবহার শির্‌ক নয়, বরং ওগুলো আবার "ই-ইয়াকা নাবুহু"-এর অন্তর্ভক্ত হয়ে পড়ে। তখন "ই-ইয়াকা নাবুহু"-এর বিষয়-বস্তু এরূপ হবে : "হে খোদা ! আমরা কেবল তোমার সাহায্য-সহায়তাই চাই না, বরং যা কিছু তুমি আমাদের সরবরাহ করেছ, তা সবই যেহেতু এই পথে আমরা ব্যয় করছি, অবশিষ্ট বলতে আমাদের কাছে আর কী-ই বা রইলো ? কিন্তু উপায়-উপকরণের যতগুলোই আমাদের জন্য তুমি আয়োজন করে-ছিলে, সেগুলো যেহেতু তোমার ইচ্ছে ও আদেশ ব্যতিরেকে কার্যকরই হতে পারে না, আমরা যে এ সব কিছু সঙ্গে নিয়ে তোমার দরবারে হাযের হয়েছি, এখন সাহায্যও তোমার কাছেই চাই। তোমার নির্দেশমত (আমাদের সাধ্যমত) ওসবই করে ফেলেছি, এখন ফলোদয় ঘটানো তোমারই ইখতিয়ারভুক্ত। "ওয়া ই-ইয়াকা নাস্তাঈন"—আমরা যেহেতু কেবল তোমারই সেহেতু তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।" অতএব, সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে দোয়ার পদ্ধতি ও রীতি-নীতি শিখার সার্বিক বিষয়-বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত। তদনুযায়ী এই যাবতীয় পরিসরে নিজেদের দোয়াকে ছড়িয়ে দিন। তাহলে আপনাদের দোয়াতে অধিকতর প্রসারতা এবং গভীরতার সৃষ্টি হবে। দোয়ার এই যে-সব বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি "ই-ইয়াকানাবুহু ওয়া ই-ইয়াকানাস্তাঈন"-এর মাধ্যমে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি, ইহাও এর অন্তর্ভুক্ত —যদি আপনারা তা পালন করে যেতে পারেন—যে "হে খোদা ! আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি, কার্যতঃ অন্য সবার সাথে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছি। এই মওকাতে তুমি যা করতে বলেছো কেবল তা-ই আমরা করছি। এবং তা সত্ত্বেও আমরা নিজের হাতে বা শক্তিতে কোন কিছুও লাভ করতে সক্ষম নই, কেননা আমাদের দোয়ার মাঝেও আমরা জানি না সেই একাগ্রচিত্ত উদ্দীপনা এবং আত্মশক্তি নিহিত আছে কিনা, যা দোয়া কবুল হবার নিদর্শনস্বরূপ হয়ে থাকে। আমরা জানি না আমাদের উপায়-উপকরণও যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত কিনা।" যদি উপায়-

উপকরণ অপর্যাপ্ত হয়, তাহলে মানুষ আবার গয়ের-আল্লাহ্‌র দিকেও ধাবিত হতে পারে। গয়ের-আল্লাহ্‌র দিকে যাওয়ার একটি অর্থ এ-ও হতে পারে যে, পুরো উপায় ও গৃহীত সব ব্যবস্থাই আর কাজ করছে না। চল, ঘুষ দিয়ে উপায়-উপকরণকে সহজতর করে নেই। তাহলে এ দোয়াই তখন এক মহান দোয়ায় পরিণত হবে এবং কার্যকরী হবে এই অর্থে যে, "আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু করা সম্ভব ছিল তা আমরা করেছি, আর এজন্যে করেছি যে, তা করতে তুমি বলেছিলে। এজন্যে তো করি নি যে, এর উপর আমরা ভরসা করছি। আর 'ইয়াকানা'বুদু'—কেবল তোমারই যে ইবাদত করছি, তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, কোন কোন অবিধেয় উপায়-উপকরণ আমাদের পথে এসেছিল—মানুষেরা আমাদেরকে বুঝিয়েছে যে, যদি তোমরা চাও তাহলে এই কাজও করা যেতে পারে। তখন আমরা থেমে গেলাম, বিরত থাকলাম, যাতে তোমার সমীপে এই দোয়া নিয়ে হাযির হতে পারি যে, "ইয়াকানা'বুদু"—তাতে যেন যৎকিঞ্চিতও ক্লেদ না থাকে, কোন খুঁত এতে যুক্ত না হয়। সেজন্য এখন আমাদের সবটুকুই তোমার সমীপে উপস্থিত করছি।" এহেন দোয়া অগ্রাহ্য হতেই পারে না। হওয়া অসম্ভব। বিপুল সংখ্যায় আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ইহার অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা করে দেখেছেন। উল্লেখিত শর্তাবলী সহকারে আপনারা যদি আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হন, তাহলে হতেই পারে না যে, ইহা কবুল না হয়। যদি কোথাও কবুল হচ্ছে না বলে দেখা যায়, তাহলে মনে রাখবেন যে, বিশ্বস্ততা (ওফাদারী) এবং ধৈর্যশীলতা বলতে একটি দিক আছে। "ই-ইয়াকা না'বুদু"-এর মাঝে এ বিষয়-বস্তুটিও অন্তর্নিহিত যে, "হে আল্লাহ্‌! আমরা তোমারই ইবাদত করি, "ওয়া ই-ইয়াকা নাস্তাঈন"—এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। এটা মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার স্বরূপ আর থাকলো না। এটা কয়েক মাসের ব্যাপারও নয়। বছর দুই-একের ব্যাপারও নয়। বরং আজীবন আমরা এটা করতেই থাকবো। কাজেই নিরাশ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। বার্ধক্যের দরুন আমাদের মাথা যদি শুভ্রকেশে প্রজ্জ্বাল হয়ে উঠে, তবুও বলবো, তোমার কাছে দোয়ার ক্ষেত্রে যারা নিরাশ হয়ে পড়ে, আমরা তাদের কেউ নই।" অতএব, কোন সময় দোয়ার প্রসঙ্গে ধৈর্যের বিষয়-বস্তুরও অবতারণা হয়, যা 'ই-ইয়াকা না'বুদু'-এরই শামিল। সেজন্য একথা বলা যথার্থ নয় যে. দোয়া কবুল হয় নি। কেননা, ইহা দোয়ার শর্তাবলীতে পরীক্ষার একটি রীতি। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, তোমরা যে বলে থাক যে, সব-কিছুই তোমরা আমার কাছে বিলিয়ে বসেছো, সর্বস্বই আমার নিকট সমর্পণ করেছো, সারা জীবনের বিশ্বস্ততা আমার চরণে লুটিয়ে দিয়েছো, বেশ, দেখা যাক, প্রকৃত প্রস্তাবে তোমরা সত্যনিষ্ঠ কি-না। তবুও যখন মানুষ আবারও বিশ্বস্ততারই পরিচয় দেয়, তখন আল্লাহ্‌তা'লা সে বান্দার জীবনভর করা তার সমস্ত দোয়া কবুল করে নেন ঐ মুহূর্তে যখন সে অন্যান্য (মিথ্যা) মাবূদদের ছেড়ে দিয়ে ওফাদারীর সাথে দোয়ায় স্থির থাকে। নিঃসন্দেহে সে চিরকালের জন্য খোদাতা'লার কোলে এসে যায়। অতএব, এটাও একটি কারণ যে, তার দোয়া কবুল হচ্ছে না বলে মানুষ কোন সময় ধোঁকার শিকার হয়ে পড়ে। অন্যান্য আরও কারণও ঘটে, যা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বর্ণনা করেছেন। যেমন,

মানুষ তার দোয়াতে যা কামনা করছে তা তার স্বপক্ষে মঙ্গলজনক নয়। তবুও খোদাতা'লা তার দোয়াকে রদ করেন না, বরং তার চে' উত্তম জিনিস তাকে দান করেন। আবার কোন সময় সে যে বিষয়ে দোয়া করছে, উহার বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম কিছু সময় চায়। উহা তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে না। তা প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী হয়। সেজন্য ধৈর্যের প্রয়োজন রয়েছে এবং তওয়াক্কুলেরও। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, যেখানে তোমরা বাহ্যতঃ অগ্রহণযোগ্য দোয়াও দেখতে পাও, স্মরণ রেখো, সেসব ক্ষেত্রেও যদি ধৈর্যের পরিচয় দাও এবং 'ই-ইয়াকানা'বুহু ওয়া ই-ইয়াকানাস্তাঈন'-এর ডাক অব্যাহত রাখ, তাহলে যা তোমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করছো তার চে' তিনি বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন। কিছু তো এজন্যে যে, যে বিশ্বস্ততার সাথে তা চাওয়া হচ্ছিল তদ্দরুন দান করা তো আবশ্যকীয়ই ছিল। কিন্তু যা চেয়েছিল তা না পাওয়ার দরুন সাময়িকভাবে বান্দার মনে যে একটু আঘাত এসেছে সেজন্য অন্যভাবে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে কোন কোন সময় আল্লাহ্‌তা'লা কেবল অশ্রু-মোচনই করেন না বরং বহুগুণ মনস্তুষ্টিও সাধন করেন। যা চাওয়া হয়েছিল, তা বাহ্যতঃ কবুল হলো না বটে, কিন্তু আল্লাহ্‌ নিজ সন্নিধান থেকে তার চে' ঢের বেশী ঢেলে দেন, যেন তিনি নিজ পক্ষ থেকে জরিমানা শোধ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ত'লার জন্য তো কোনও জরিমানার প্রশ্নই নেই, কিন্তু মানুষ যেমন কোন সময় কাউকে বলে, আমি তোমাকে একটি জিনিস দিবো বলে বলেছিলাম না? তা যেহেতু ভুলে গিয়েছিলাম, এখন আমার তরফ থেকে এই নাও—এটা আমার (ভুলের) মাশুল।

অতএব, আল্লাহ্‌তা'লার কী অদ্ভুত শান ও মর্যাদা! যখন তিনি সস্নেহে কারো প্রতি ঝুঁকেন, তখন এতো ঝুঁকেন যে, চরম লাঞ্ছিত বান্দাদেরও ঘরে উপস্থিত হয়ে তাদের দান করেন এবং নিজের উপর শর্ত আরোপ করে নেন এই বলে যে, এখন আমি তোমাদেরকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দান করবো যাতে তোমাদের সব মনোকষ্ট ও বিরক্তিবোধ বিদূরিত হয়। এ হচ্ছে ইবাদতের বিষয়-বস্তু, যার আরো বহু দিক রয়েছে, কিন্তু এটুকু বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করি। বস্তুতঃ "ইবাদুল্লাহ্‌"-তে পরিণত হওয়া অপরিহার্য আমাদের জন্য। যদি আল্লাহ্‌র (প্রকৃত) বান্দায় পরিণত হই, তাহলে সারা জগত আমাদের জন্য হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়া এজন্য নয় যে, সারা জগৎ যেন আমাদের হয়ে যায়। বরং এজন্যে যে, আমাদের সর্বস্ব যেন তাঁরই হয়ে যায়। এই রূহের (—আত্মপ্রেরণার) সাথে ইবাদত করুন এবং এ রূহের সাথেই খোদাতা'লার কাছে ইবাদত (পালনের ক্ষমতা ও সামর্থ্য) কামনা করুন। তারপর দেখুন, দুনিয়ার তক্‌দীর যে কত শীঘ্র পাল্টে যাবে! সারা বিশ্বব্যাপী বিপ্লব সংঘটিত হবে, যার জন্যে আপনারা প্রত্যাশা করে আছেন, এবং আপনাদের সময়কাল সম্পর্কীয় পরিমাপ বদলে যাবে। আল্লাহ্‌তা'লা ইহার তওফীক আমাদের দান করুন। কুরআন করীমের আয়াতসমূহ হতে সত্যিকার হেদায়াত ও পথ-নির্দেশনা লাভ করে তদনুযায়ী চলার ও আমল করার আমাদের তওফীক দিন। আমীন।

(এম-টি-এ থেকে প্রচারিত খোৎবার ও-ডি-ও ক্যাসেট থেকে অনূদিত)

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ধর্মীয় পুণ্যকে পণ্যে পরিণত

কুরআন পাকে আল্লাহ্ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেছেন। এ সবের পরিণতিতে তাঁর শাস্তি বিধানেরও উল্লেখ করেছেন। এ বাড়াবাড়ির দুটো প্রধান ক্ষেত্র হলো আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষদের শিক্ষা ও আদর্শের বিরোধিতা করা। দ্বিতীয়তঃ ধর্মের দাবীদার হয়ে তা পালন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি অর্থাৎ সীমা লংঘন করা। এখানে দ্বিতীয়টি নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা হচ্ছে।

রমযান মাসে এ বাড়াবাড়ির একটা প্রকট রূপ দেখা যায়। প্রকট এজন্যে বলছি, সংযমে অভ্যস্থ হওয়ার উদ্দেশ্যে যে মাসকে আল্লাহ্ বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন সে মাসেই নানাভাবে চলে এর বাড়াবাড়ি। একদল রোযা রাখুক বা না রাখুক ঈদের কেনাকাটিতেই অর্থ ছাড়াও সময়, শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে থাকে। তাদের ব্যস্ততা রমযানের শুভাগমনের ২-১ সপ্তাহ আগেই শুরু হয়ে যায়। ক্রমাগত তা বাড়তে থাকে। ঈদের আনন্দই তাদের কাছে রমযানের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা কাপড় চোপড় ও অলংকারাদি ক্রয়েই ব্যস্ত থাকে। গত কয়েক বছর যাবত আর এক দলকে দেখা যাচ্ছে, রমযানের পবিত্রতা রক্ষার নামে অতি ব্যস্ত হয়ে ওঠতে। তাদের এ ধরনের পবিত্রতা রক্ষার সাথে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের কতটুকু সংযোগ আছে তা তারা মোটেও বোঝবার চেষ্টা করে বলে মনে হয় না। তারা যেন নিজেদের খেয়াল খুশীকে ধর্মের পোষাক পরায়। এখানে অনুরূপ একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। ২৯-১-৯৭ তারিখের জনকণ্ঠের খবরটি হলো।

শিবির কর্মীদের ভাংচুর

(স্টাফ রিপোর্টার চট্টগ্রাম অফিস)

সোমবার সীতাকুণ্ড সদরে একদল শিবির কর্মী একটি রেষ্টুরেন্ট এলোপাতাড়ি ভাংগচুর করেছে। রমজান মাসে দিনের বেলায় রেষ্টুরেন্টটি খোলা রাখার অপরাধে তারা ভাংচুর চালায়। রেষ্টুরেন্টে আহাররত নূরহাদি নামক এক ব্যক্তিকে বেধড়ক পিটানো হয়।

এ নিয়ে অনেক কথা বলা যায়। আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার জন্যে এরূপ আচরণকারী বিশেষ করে তাদের নেতাদের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই। শহরের হোটেল রেষ্টুরেন্টে মুসলমান ছাড়া ভিন্ন ধর্মের লোকেরা খেয়ে থাকে। তাদের প্রয়োজনকে কি করে অবহেলা করা যায়? তাছাড়া মুসলমান হয়েও যাদের আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করতে গিয়ে দিনের বেলা খেতে হয়, তারা কোথায় যাবে? তারা হলো অসুস্থ ও সফরে আছেন এমন মুসলমান।

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে

(১)

১৯৩২ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৯৬৩ সনের ৯ই মার্চ তারিখের আল্ ফযল এবং ১৫ই মার্চ, ১৯৬৩ সনের পাক্ষিক আহমদী ১৬ পৃষ্ঠা হতে হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ সানীর (রাঃ) হুকুম নামা উদ্ধৃত করা হল।

"যেহেতু প্রদেশের কাজের জন্য তিনি (আমীর) শুধু প্রদেশের প্রধান নগরের বন্ধুগণের পরামর্শের উপর নির্ভর করিতে পারেন না এজন্য আমি নির্দেশ দিতেছি যে, প্রাদেশিক আমীরের একটি শূরা মজলিস থাকিবে। উহাতে প্রদেশের সব মোকামী আমীর থাকিবেন এবং তাহাদের ছাড়া সেলসেলার মোবাল্লিগগণও ইহার সভ্য হইবেন। তাঁহাদের ছাড়াও যদি কাহাকেও বিশেষভাবে মরকয হইতে এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয় বা প্রাদেশিক আঞ্জুমান তাঁহাদের বাৎসরিক সম্মেলনের সময় কোন কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে এই কাজের জন্য মনোনীত করে তবে তাহাদিগকেও মজলিসের সভ্য মনে করিতে হইবে"।

(২)

হুযূরের (আইঃ) অনুমতি সাপেক্ষে আগামী ১৩ এবং ১৪ জুন শুক্র ও শনিবার দারুত তবলীগে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক জামাত থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধির যোগদান বাধ্যতামূলক। শূরা প্রতিনিধিদের শূরায় অনুপস্থিত থাকা অপরাধ। এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। চাঁদা পরিশোধ করুন।

(৩)

আমাদের ধর্ম শুরু হয়েছে খিলাফতের মাধ্যমে। প্রত্যেক নবী খলীফাতুল্লাহ্। প্রত্যেক নবীর পর তাঁদের খলীফা হয়ে থাকেন। খলীফা মাত্রই আমীরুল মোমেনীন। তাঁরা ওয়াযিবুল এতায়াত ইমাম। যুগ-খলীফা বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে আমীর নিয়োগ করে থাকেন। আমীরকে মান্য না করলে খলীফাকে মান্য করা হয় না। খলীফাকে মান্য না করলে নবীকে অমান্য করা হয়। আর নবীর নাফরমানী স্বয়ং আল্লাহ্তা'লার নাফরমানী। খলীফা বা আমীর একনায়ক নন। কারণ খলীফা আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশিত পথে চলেন। আমীর চলেন যুগ-খলীফার হুকুম মোতাবেক। খলীফা বা আমীর নিজ খেয়াল খুশীমত চলেন না। খলীফার গর্দান আল্লাহ্র হাতে আর আমীরের গর্দান খলীফার হাতে। সকলের উচিত

(অবশিষ্টাংশ ৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাড়ী ঘরে শিশুরা ছাড়াও অন্যদের কেউ কেউ বৈধ কারণে রোযা রাখে না তাদের দ্বারা কি এর পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে? না, তা কখনও নয়। বড় প্রশ্ন হলো রোযাদারদের সামনে কেউ কিছু খেলে রোযার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় এ কথা তারা পেলেন কোথায়? কুরআন হাদীসে আছে কি? সাধারণ জ্ঞানে তো মনে হয় কেউ রোযাদারের সামনে খেলেও তিনি সবুর করার কারণে রোযার পবিত্রতা বেড়ে যাবে। আরো একটি প্রশ্ন হলো হোটেল রেষ্টুরেন্ট ভাংচুরে রোযার পবিত্রতা বাড়ে এর কোন যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ আছে কি? এতে তো বরং 'ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই' আল্লাহ্‌র এই সুস্পষ্ট নির্দেশকে ভংগ করা হয়। এতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন কি?

ইফতার পার্টির হুজুগে আসা যাক। রমযান মাসে পত্রিকাদিতে ইফতার পার্টির অনেক খবর থাকে। এসবে ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শের বিষয়াদি তো খুব কমই দেখা যায়। রাজনৈতিক কথা-বার্তাই বেশী থাকে। কূটনীতির মার প্যাঁচও অনেক দেখা যায়। কোন নেতা নেত্রী কোন পার্টিকে অবহেলা করছেন তা বুঝতে কঠিন হয় না। রোযার মাসতো মনোমালিন্য দূর করার মাস। ইফতার পার্টি যেন ছোঁয়াচে ও মহামারির রূপ ধারণ করছে। তা না হলে নয়া দিল্লীতে হিন্দু নেতারা এরূপ পার্টি দিবেন কেন? ওয়াশিংটনও বসে নেই। আমাদের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমেরিকার ফাষ্ট লেডি হিলারি ক্লিলিংটন ইফতার পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছেন। এসব দেখে শুনে ঢাকার চকবাজারে প্রচলিত একটি প্রবাদ মনে পড়ে গেলো আর তাহলো "রোযাও রাখবো না, ইফতারও করবো না তবে কি জাহান্নামে যাবো?" ইদানিং পুলিশের এক খবরে প্রকাশ! বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করার জন্য নাকি একটি রাজনৈতিক দল ইফতার পার্টির ব্যবস্থা করেছিলো। নেতারা এতিম খানার এতিমদের নিয়েও ইফতার পার্টি করছেন। তাদের সাথে সহমর্মিতাকে হেয় করে দেখা যায় না। তবে কথা হলো এতিমখানার এতিমরা অনেকখানি সংগঠিত এবং তাদের পেছনে প্রতিষ্ঠানিক সাহায্য সহায়তা রয়েছে। কিন্তু দেশে যে হাজার হাজার এতিম ও চরম দরিদ্রে নিষ্পেষিত পরিবার রাস্তা-ঘাটে নিঃসহায় জীবন যাপন করছে তাদের ধনীরা ও নেতারা ইফতার না করান অন্ততঃ ওদের কথা তাদের ভাবনা চিন্তায় আছে কিনা রমযানে এমন কোন চিহ্ন দেখা যায় না। তবে এবার ফেব্রুয়ারী মাসের গোঁড়াতেই মাইক্রো ক্রেডিট (ক্ষুদ্র ঋণ) বিশ্ব সম্মেলন হয়ে গেলো যা দেশের প্রধান মন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। এটাকে একটি শুভ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। ইহাকে সুদমুক্ত করে কর্যে হাসানায় রূপান্তরিত করলেই তা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ইফতারির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি। তা হলো ইফতারের সময় সম্পর্কে। রসূল করীম (সাঃ)-এর সুন্নত ও নির্দেশ হলো সূর্য ডোবার সাথে সাথে যত শীঘ্র সম্ভব ইফতার করা। এতে বিশেষ গুরুত্বসহ রোযার মাধ্যমে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রায়ই এদিকটাকে গুরুত্ব না দিয়ে সূর্য ডোবার সাথে তিন থেকে পাঁচ সাত যোগ করে পরে ইফতার করার রেওয়াজ চালু করতে। এতে নাকি রোযা পাকা হয়। এসব কি কখনও গ্রহণীয় হতে পারে? যারা সেহরী হতে শুরু করে সারাদিন না খেয়ে থাকতে পারে তারা আর কয়েক মিনিট থাকতে পারবে কিনা আল্লাহ্ এখানে সে পরীক্ষা নিচ্ছেন বলে মনে হয় না।

রমযান মাসেই সাধারণতঃ যাকাত আদায় করা হয়। যাকাতের অর্থ কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে নির্দেশ কুরআনে আছে। তা পালন না করে ব্যক্তিগত খেয়াল খুশী মত তা বিতরণ করলে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আজকাল অনেকে খুব খর্চা করে 'যাকাতের' কাপড় বিতরণ করবেন বলে জোর প্রচার চালান। নির্দিষ্ট দিনে কাপড়ের জন্যে হন্যে হয়ে দলে দলে গরীবরা হাজির হয়। এমন ভীর জমে যে, এর চাপে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। কয়েক বছর যাবত এরূপ চলছে, তবু তা বন্ধ হচ্ছে না। যারা এভাবে 'যাকাত' বিতরণ করে তারা সমাজে নিজেদের ধনী ও ধার্মিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলাম বিরোধী প্রথা চালু করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বলে মনে হয়। অপরদিকে আরেক দল যাকাতের জন্য অতি নিম্নমানের কাপড় তৈরি ও বিক্রী করে প্রচুর লাভ করে থাকে। ধর্মকে প্রত্যক্ষ পণ্যে পরিণত করা হয়। আরো মজার কথা আছে। যেমন শতকরা একশভাগ 'হালাল' সাবান, ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রূহ আফযায়ে হঠাৎ করে হালালের অনুপ্রবেশও অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে যে, তবে কি তা আগে হালাল ছিল না। ধর্মের নামে এসব বাড়াবাড়ি এতে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি?

আল্লাহ্র দরবারে হাজার শোকর যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফাগণের পরিচালনায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত এ ধরনের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ হতে মুক্ত আছে।

(৩১ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

আমীরকে মান্য করা। ভাল মন্দের জন্য আমীর খলীফার কাছে জবাবদিহি করবেন। বড় মর্যাদা বা অধিক বিদ্যার কারণে আমীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। এহেন অহংকার মানুষকে ইবলীস বানিয়ে দেয়। মহানবী (সাঃ)-কে তুচ্ছ জ্ঞান করে আবুল হাকাম আবু জাহল হয়ে গিয়েছিল। খলীফাতুল মসীহ সানীকে (রাঃ) না মেনে অহংকার করে এম, এ, এল এল, বি ও মৌলানা এবং পণ্ডিতেরা ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব, সাবধান! বিদ্যা, বুদ্ধি আর জাগতিক বড় পদের অহংকারে কেউ যেন ইবলীস, আবু জাহল এবং পয়গামীদের মত না হয়। মনে রাখতে হবে, চেষ্টা করে কেউ আমীর হতে পারে না। খলীফা ছাড়া আমীরকে কেউ পদচ্যুতও করতে পারে না। শূরায় এসে পরামর্শ দিন।

আহমদীয়া তবলিগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(২৯তম কিস্তি)

দ্বাদশ ভবিষ্যদ্বাণী : মুসলেহ মাওউদ ও সুসংবাদপ্রাপ্ত সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে :

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে শুভ সংবাদ দেন যে, তাঁর (সাঃ) মাধ্যমে ইসলামের সাহায্য ও বিশ্ব-বিজয়ের জন্যে যে জামাত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ইহা তাঁর (আঃ) মৃত্যুর পরে সদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং উন্নতি করতে থাকবে। আর তাঁর (আঃ) জামাত, পরিবার ও সুসংবাদপ্রাপ্ত সন্তানদের দ্বারা ইসলামের সাহায্যের একটি ভিত্তি স্থাপিত হবে যা পৃথিবীতে ভবিষ্যতে ইসলামের সত্যতা ও বিশেষ শান ও শওকতের কারণ হবে। এ শুভ সংবাদ কেবল হযরত আকদস (আঃ)-কেই দেয়া হয় নি বরং আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও মসীহ্ মাওউদ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে বলেছেন : "ইয়াতাযাওয়াজু ওয়া ইউলাহুলাহু" অর্থাৎ, যখন মসীহ মাওউদ আখেরী যুগে আবির্ভূত হবেন তখন তিনি বিয়ে করবেন ও তাঁর জামাতের শক্তিশালী হওয়ার ও উন্নতি সাধনের জন্যে তাঁর সন্তান-সন্ততি হবে (মিশকাত বাব নুযূলে ঈসা)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও তাঁর সন্তানাদির ব্যাপারে এ শুভ সংবাদের কথা উল্লেখ করেছেন :

"আল্লাহ্‌তা'লা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আমার ভবিষ্যত প্রজন্ম থেকে একটি বৃহৎ বুনিয়াদ ইসলামের সেবায় নিয়োজিত হবে। এদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন যে, নিজ সত্তায় আসমানী রূহ বহন করবে। এজন্যে তিনি পসন্দ করলেন যে, ঐ পরিবারের মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দেন এবং তাথেকে ঐ সন্তান জন্ম দেন যে ঐসব জ্যোতিকে জগতে বিস্তার দান করে যা আমার হাত দ্বারা বপন করা হয়েছে। আর অবলীলায় ইহা বিস্ময়কর যে, যেভাবে সাদতের দাদীর নাম শহরবানু ছিলো এভাবেই আমার স্ত্রী যে ভবিষ্যত প্রজন্মের মা হবে তার নাম নুসরৎ জাহাঁ বেগম। তাফাওল (যে সংকেত দ্বারা ভবিষ্যতের শুভাশুভ নির্ধারণ করা হয়—অনুবাদক)-এর পদ্ধতিতে ইহা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত নিদেশ করে যে, খোদা সারা জগতের সাহায্যের জন্যে আমার ভবিষ্যত প্রজন্মের ভিত্তি রেখেছেন। ইহা খোদাতা'লার নিয়ম যে, নামের মধ্যেও তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী লুক্কায়িত থাকে।" (তিরিয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫)

এভাবে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে হযরত আকদস (আঃ) বলেন :

মসীহ মাওউদ-এর বিশেষ চিহ্নাদির ব্যাপারে ইহা লেখা আছে যে, ... বিয়ে করবেন এবং তাঁর সন্তানাদি হবে .. ইহা ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, খোদাতা'লা তার ভবিষ্যত

প্রজন্ম থেকে এমন এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন যিনি তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। আর ইসলাম ধর্মের সেবা করবেন যেভাবে আমার কতক ভবিষ্যদ্বাণীতে খবর এসেছে।"

(হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ৩১২)

হযরত আকদস (আঃ)-এর এ স্থলাভিষিক্ত এবং ইসলাম ধর্মের বিশেষ সাহায্যকারী প্রতিশ্রুত পুত্র সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা ইলহামী পদ্ধতিতে যে খবর হুযূর (আঃ)-কে দেন উহা তার আসল কথায় নিম্নে প্রদত্ত হলো। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন:

"সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো, এক সুদর্শন ও পবিত্র পুত্র তোমাকে দেয়া হবে। একটি মেধাবী গোলাম (পুত্র) তুমি লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত তোমারই বংশধর ও ভবিষ্যত প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত হবে। .....তার সাথে ফযল (বিশেষ কৃপা) রয়েছে। ইহা তার আগমনের সাথে আগমন করবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে দুনিয়াতে আসবে ও তার মসিহী সঞ্জীবনী শক্তি ও সত্যের আত্মার কল্যাণে বহু লোককে ব্যাধি মুক্ত করবে। সে কালিমাতুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র বাণী। কেননা, খোদার করুণা ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে কলেমা তামজীদ (আল্লাহ্‌তা'লার মহিমা ও মাহাত্ম্য কীর্তন) দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান ও প্রজ্ঞাশীল এবং সহনশীল হৃদয়সম্পন্ন হবে। আর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। আর সে তিন কে চার করবে..... ঐ সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ প্রিয় পুত্র। মাযহারুল আওয়ালে ওয়াল আখেরে—মাযহারুল হাক্কে ওয়াল 'উলা—কাআন্নাল্লাহা নাযালা মিনাস্ সামায়ে (অর্থাৎ প্রারম্ভে ও শেষে বিকাশ-স্থল। সত্য ও গরিয়ানের বিকাশস্থল যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন) যার অবতরণ খুবই কল্যাণমণ্ডিত আর ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে জ্যোতিঃ। যাকে আল্লাহ্‌তা'লা তার সন্তুষ্টির সৌরভের দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে স্বীয় আত্মা ঢেলে দেবো এবং খোদার ছায়া তার শিরোপরি থাকবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করবে। আর বন্দীদিগের মুক্তির কারণ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে। আর জাতিসমূহ তার নিকট থেকে কল্যাণ লাভ করবে।"

(তাযকেরা, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২, দ্বিতীয় সংস্করণ)

এ প্রতিশ্রুত ও বিশেষ পুত্রের ব্যাপারে হুযূর (আঃ) তোহফা গুলড়াবিয়া পুস্তকে বলেন:

"খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তোমার কল্যাণের জ্যোতিঃ দ্বিতীয়বার প্রকাশ করার জন্যে তোমারই ভবিষ্যত প্রজন্ম থেকে এক ব্যক্তিকে খাড়া করা হবে যার মধ্যে পবিত্র আত্মার কল্যাণ ফুঁকে দেবো। সে পবিত্র হৃদয়সম্পন্ন ও খোদার সাথে অতীব পবিত্র সম্পর্ক রাখার অধিকারী হবে। আর মাযাহারুল হাক্কে ওয়াল 'উলা হবে। যেন খোদা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সুতরাং খোদার ফযল ও করমে এ মসিহী গুণবিশিষ্ট মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংশোধনকারী) পুত্র উপরোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এবং ঐশী সুসংবাদ অনুযায়ী ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অস্তিত্বে রূপ লাভ করলো। ইলহাম অনুযায়ী তাঁর নাম রাখা হলো বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ। যেহেতু ঐ প্রতিশ্রুত পুরুষের একটি ইলহামী নাম ফযলে উমরও ছিলো তাই হযরত খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জামাতের খেলাফতের আসন অলংকৃত করেন এবং প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পর্যন্ত তিনি (রাঃ) ইসলামের সেবায় দৃষ্টান্তবিহীন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে সারা জগতে ইসলামের তবলীগের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লাহু ওয়ারফা'উ দারাজাতিহী ফি 'আলা ইল্লীন (অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি তাঁর মাগফেরাত দান করো এবং সুউচ্চ ইল্লীনে তাঁর মর্যাদাসমূহ উন্নত করো—অনুবাদক)

এভাবে হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালামের অন্য তিন পুত্রও ঐশী সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জন্ম নেন যাদের প্রত্যেকের জন্মাবার পূর্বে হযরত আকদস (আঃ) বিস্তারিতভাবে তা প্রকাশ করে দেন। তাই হুযূর আকদস (আঃ) তাঁর এসব পুত্রদের জন্মের শুভ সংবাদের উল্লেখ করতে গিয়ে লেখেন :

"এই চারজন পুত্র (মুসলেহ মাওউদসহ) জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীর তারিখ আর পরে জন্মগ্রহণের তারিখ ও জন্মগ্রহণের সময় এমন কি আবার বড় ছেলে মাহমুদের জন্ম হওয়ার ব্যাপারে আমি ১০ই জুলাই, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞাপনে এবং আরও আমার ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞাপন যা সবুজ রং-এর কাগজে ছাপা হয়েছিলো, ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো যে, ঐ জন্মগ্রহণকারী পুত্রের নাম মাহমুদ রাখা হবে। .....যখন ঐ ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে চতুর্দিকে জানাজানি হয়েছিলো.....তখন খোদাতা'লার আশীষ ও করুণায় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী রোজ সোমবার মাহমুদ জন্ম নিলো..... আর আমার দ্বিতীয় পুত্র যার নাম বশীর আহমদ, তার জন্মাবার ভবিষ্যদ্বাণী আয়েনায়ে কামালাতে ইসলামের ৬৬৬ পৃষ্ঠায় করা হয়েছিলো। .....আবার যখন এ পুস্তক যার দ্বিতীয় নাম 'দাফেউল ওয়াসায়েস'ও যখন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী ইহা প্রকাশিত হলো তখন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০ শে এপ্রিল এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐ ছেলে জন্মগ্রহণ করে যার নাম বশীর আহমদ রাখা হয় .....আর আমার তৃতীয় পুত্র যার নাম শরীফ আহমদ তার জন্মগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী আমার পুস্তক আনওয়ারুল ইসলাম-এর ৩৯ পৃষ্ঠার পাদ টীকায় লেখা আছে এবং এ পুস্তক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছিলো ... এ পুত্র অর্থাৎ শরীফ আহমদ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে মোতাবেক ২৭শে যিলকদ ১৩১২ হিজরী জন্মগ্রহণ

করে এবং আমার চতুর্থ পুত্র মোবারক আহমদ, তার ব্যাপারে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারীর বিজ্ঞাপনে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং পরে আঞ্জামে আথমের ১৮৩ পৃষ্ঠায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। আর আঞ্জামে আথমের ৫৮ পৃষ্ঠায় এ শর্তের সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অমৃতসরের অধিবাসী মৌলবী আব্দুল জব্বার গযনভী-এর জামাতে অবস্থানরত আব্দুল হক গযনভী মারা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এ চতুর্থ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এবং এ ৫৮ পৃষ্ঠায়ই ইহাও লেখা হয়েছিলো যে, যদি আব্দুল হক গযনভী আমার বিরোধিতায় সত্য পথে থেকে থাকে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত হয়ে থাকে তাহলে দোয়া দ্বারা ঐ ভবিষ্যদ্বাণী টলিয়ে দিক। সুতরাং খোদাতা'লা আমার সত্যায়নের জন্যে এবং সকল বিরুদ্ধবাদীকে মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন করার জন্যে এবং আব্দুল হক গযনভীকে সতর্ক করার জন্যে এর ওপরে চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণীকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন রোজ বুধবার পূর্ণ করে দিলেন অর্থাৎ ঐ পুণ্যবান চতুর্থ পুত্র উল্লেখিত তারিখে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং এ পুস্তক প্রণয়নের আসল উদ্দেশ্য ইহাই যে, যেন ঐ মহান ভবিষ্যদ্বাণী যার অঙ্গীকার আল্লাহ্-তা'লার পক্ষ থেকে চার বার করা হয়েছিলো উহা যেন দেশে প্রচার করা হয়। কেননা, মানুষের সাহসই হতে পারে না যে, এ পরিকল্পনার চিন্তা করে যে, প্রথমে তো আলাদাভাবে চারজন পুত্রের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে আবার প্রত্যেক পুত্রের জন্মগ্রহণ করার পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে এবং এতদনুযায়ী পুত্র হতে থাকে এমনকি ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত চার পুত্রের জন্মের কথা পূর্ণ হয়ে যায়……ইহা কি সম্ভব যে, আল্লাহ্তা'লা মিথ্যাবাদীকে ধারাবাহিকতার সাথে এভাবে সাহায্য করতে থাকেন? মিথ্যাবাদীকে কি আল্লাহ্তা'লা কখনও এভাবে সমর্থন করেছেন বা ভূপৃষ্ঠে এমন কোন দৃষ্টান্তও আছে ……যে, অমুক ব্যক্তি মারা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ চতুর্থ পুত্র জন্ম না নেয় এবং তার এ কথা মোতাবেক পরে চতুর্থ পুত্র জন্মগ্রহণ করে? আকাশের নিচে কাউকে কি এমন শক্তি দেয়া হয়েছে যে, মাঠে দাঁড়িয়ে ধারাবাহিকতার সাথে জোরে শোরে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ করতে থাকে এবং পরে সর্বদাই পূর্ণ হতে থাকে?"

(যমীমা তিরইয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৪২-৪৪) (চলবে)

সংশোধনী ঃ

গত সংখ্যার (১৫-৪-৯৭) পাক্ষিক আহমদীর ১৬ পৃষ্ঠার ২৮ লাইনে "আর উহার 'মায়া-নায' যুদ্ধ জাহাজের বহর"-এর পরিবর্তে "আর তাদের গৌরবময় যুদ্ধ জাহাজের বহর" পড়তে হবে—অনুবাদক।

পত্র-পত্রিকা থেকে

আলজেরিয়ায় ২২ জনকে হত্যা করেছে মৌলবাদীরা

কাগজ ডেস্ক : আলজেরিয়ার মুসলিম মৌলবাদি গত শুক্রবার রাতে রাজধানী আল-জিয়ার্সের উত্তরাঞ্চলে একটি গ্রামে আকস্মিকভাবে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে অন্তত ২২ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। গতকাল উক্ত গ্রামবাসিদের সূত্রে এ খবর জানা গেছে। সরকারি সূত্রও মুসলিম মৌলবাদীদের এ গণহত্যার খবর স্বীকার করেছে। তবে সরকারি প্রচার মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলা হয়নি।

এপি আরো জানায়, আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সের প্রায় ৩৫ কিলোমিটার উত্তরে মিনা গ্রামে শুক্রবার শেষ রাতে মৌলবাদী মুসলমানদের এ গণহত্যা ছিলো চলতি মাসের প্রথম ব্যাপকভিত্তিক নৃশংস বর্বরতা। তারা ধারালো তলোয়ার, ছুরি এবং কুঠার দিয়ে নারী, শিশু নির্বিশেষে ২২ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে কুপিয়ে এবং জবাই করে হত্যা করে। (১৩/৪/৯৭ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

মানবাধিকার মিশনের রিপোর্ট

প্রতি ৩ ঘণ্টায় ১ জন ধর্ষিত হচ্ছে পাকিস্তানে

পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশন সেদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে এক উদ্বেগজনক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। গত সোমবার প্রকাশিত ২৪৫ পৃষ্ঠার এই বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, গত বছর পাকিস্তানে প্রতি ৩ ঘণ্টায় ১ জন করে মহিলা ধর্ষিত হয়েছে। ৬ থেকে ১১ বৎসর বয়সী শিশুদের ৫৫ শতাংশ যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রায় ৪০ লাখ শিশুকে প্রতিদিন কাজ করতে হচ্ছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, পাকিস্তানে ধর্মীয় উপাসনালয়ে গণহত্যা চালানো হচ্ছে, পারিবারিক সম্মান রক্ষার নামে অথবা অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মহিলাদের হত্যা করা হচ্ছে এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কারাগারে কয়েদিদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এপি।

মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানের গত বছরের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়। এতে বলা হয়, গত বছর দেশটিতে ধর্মীয় সহিংসতায় সাড়ে ৩০০ লোক নিহত এবং সাড়ে ৪০০ লোক গুরুতর আহত হয় মসজিদগুলোতে বোমা পাতা হয়, নামাজরত মুসল্লিদের ওপর হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং ধর্মীয় নেতাদের ওপর গুলি বর্ষণ করা হয়। রিপোর্টে নারীদের করুণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অথবা পারিবারিক সম্মান রক্ষার নামে গত বছর ৩০০-

শরও বেশী মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতি ৩ জনে দুই জন মহিলা নিরক্ষর। পক্ষান্তরে প্রতি ৪ জনে ৩ জন পুরুষ নিরক্ষর।

পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আসমা জাহাঙ্গীর সেদেশের উদ্বেগজনক মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, 'এটি খুবই করুণ অবস্থা। বাস্তবিকপক্ষে পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।' তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হবে না। রিপোর্টে এই উদ্বেগজনক মানবাধিকার পরিস্থিতির জন্য পাকিস্তানে পর্যায়ক্রমিক সরকারগুলোকে দায়ী করা হয়।

(২-৪-৯৭ তারিখের দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

নতুন ফতোয়া

আনিস আলমগীর: মৌলবাদিরা এবার নতুন ফতোয়া দিলেন জাপা নেতা এরশাদ এবং তার কথিত বান্ধবী জিনাতকে নিয়ে। শুক্রবার বাংলাদেশ ওয়ালামা পরিষদের প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম আশরাফি এবং সেক্রেটারি মাসুম হেলালি নৈতিকতা এবং ইসলাম বিরোধী ১৪ বছরের পরকিয়া প্রেমের স্বীকারোক্তির জন্যে তাদের গ্রেফতার দাবি করেছেন। 'জেনা-ব্যভিচারের' জন্যে তাদেরকে শরিয়ত অনুযায়ী প্রকাশ্যে দোররা মারার জন্যে সরকারের কাছে দাবি করেছেন। একই ধরনের দাবি করেছেন জনৈক মাওলানা তৈয়ব আলীসহ কথিত ১২ জন বিশিষ্ট আলেম। তারা বলেছেন, 'সরকার যদি এ ধরনের যৌন লীলা চলতে দেয় দেশের মুসলমানরা সরকারকেও ক্ষমা করবে না।'

(১২-৪-৯৭ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

শিখা চিরন্তন প্রসঙ্গে

আলহাজ আহমদ ময়মনী

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশে আলেম সম্প্রদায়ের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা কাজে তাদের প্রয়োজন আছে বলেই ধর্ম সম্বন্ধে অশিক্ষিত লোকেরা তাদের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। তাদের দোয়া এবং মসলা-মাসায়েল সম্বন্ধে ফতোয়াকে মুসলিম জনসাধারণ গুরুত্ব না দিয়ে পারে না।

ইদানিং একটি বিষয় নিয়ে দেশের কতিপয় আলেম শুধু ফতোয়া দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মাঠে নামার হুমকি দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

বিষয়টি হলো স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থাপিত 'শিখা চিরন্তন' নামক স্বাধীনতার প্রতীক মশালটি। কোন কোন আলেম এটিকে শির্ক এবং অগ্নিপূজা বলে এর বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করেছেন। তারা বলছেন, একমাত্র আল্লাহতায়ালাই

হলেন চিরন্তন। অতএব, চিরন্তন শব্দটি শির্‌কের সামিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, ২৬শে মার্চ ১৯৯৭ তারিখে যে 'চিরন্তন'-এর শুরু তা কি করে আল্লাহর সমক্ষক হয়? আল্লাহতো আদি অনন্ত। যার আদি আছে এবং কিয়ামতকালে যা বিলুপ্ত হয়ে যাবে তার নাম চিরন্তন রখেলে কি তা শির্‌ক হবে? কখনও বা কারো নাম যদি অমর (মৃত্যুহীন), ইয়াহিয়া (সদাজীবিত) রাখা হয় তাহলে কি তা শির্‌ক হবে? আপনারা যে 'জিন্দাবাদ' বলেন, তার অর্থ কি এই যে, ঐটি কখনও মৃত্যুবরণ করবে না? অথচ সবাই জানি একমাত্র আল্লা-তায়ালাই জিন্দা আছেন ও থাকবেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালাকে 'রব' বলা হয়েছে, অপরদিকে এই কোরআনেই পিতা-মাতাকেও 'রব' আখ্যা দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করার পর পিতা-মাতাকে রব বলা কি শির্‌ক নয়? যদি এর উত্তর 'না' হয় (এবং অবশ্যই 'না') তাহলে ২৬শে মার্চ জন্ম নেয়া চিরন্তন কি করে শির্‌ক হবে? এই 'চিরন্তন' অনাদি, অনন্ত নয়। এটি থাকবে যতদিন পৃথিবী আছে ততদিন। আলেমেরা বলেন, দোজখের আগুন চিরস্থায়ী। একথা কি শির্‌ক নয়?

এখন প্রশ্ন হল, সরকার কি এই অগ্নিশিখাকে পূজা করতে বলেছেন? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি ঐদিন ঐ মশালটিকে প্রণাম করেছিলেন বা ওর কাছে কোন প্রার্থনা করেছিলেন? যদি আগুনকে সালাম করে তার কাছে কিছু চেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই তা শির্‌ক। কিন্তু আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী এমন কিছুই করেন নি। বরং 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে তিনি তার ভাষণ শুরু করে একথাই প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃত উপাস্য এবং সব কিছুর (আগুনেরও) স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

'শিখা চিরন্তন' এদেশে নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার প্রতীক এই 'শিখা অনির্বাণ' নামে বহু পূর্ব থেকেই প্রজ্বলিত ছিল। মরহুম জিয়াউর রহমানসহ অনেক সৈনিকই ঐ 'শিখা অনির্বাণ'কে সেলুট করেছেন, নীরবে দাঁড়িয়ে সম্মান করেছেন। কৈ তখনতো আপনারা ধর্ম গেল, ইমান গেল, শির্‌ক বা হারাম, হারাম বলে চীৎকার করেননি? এর কারণ কি? স্বাধীনতা আন্দো-লনের প্রধান স্থপতি যে স্থানটিতে প্রথম স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন এবং যে জায়গাটিতে হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল বলেই কি ঐ ঐতিহাসিক স্থানটিতে স্বাধী-নতার প্রতীক শিখা প্রজ্বলনে আপনাদের গাত্রজ্বালা?

ইসলামে শুধু অগ্নিপূজাই নিষিদ্ধ নয়। সকল সৃষ্ট পদার্থের পূজাই হারাম। পূজা হবে একমাত্র স্রষ্টার যিনি আগুনসহ সকল পদার্থের খালেক ও মালেক। স্মৃতি হিসেবে কোন পাথরকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থাপন করে রাখলে তাতে পাপ হয় না। ঐ স্মৃতির পাথরে চুম্বন করলে শির্‌ক হয় না। সব কিছু নির্ভর করে নিয়তের উপরে। আগুন পানি, পাথর, কারো প্রভু নয়। ঐ সব মানুষের গোলাম। আল্লাহতায়ালা মানুষের প্রয়ো-জনে ঐসব সৃষ্টি করে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। আমরা নানাভাবে ঐ সব বস্তুকে কাজে লাগিয়ে থাকি। ধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তিও আগুনের পূজা করতে পারে না। কেননা তাতে তার মনুষ্য সত্তার অপমান হয়। বড় হয়ে ছোটকে পূজা করা যায় না। আকবর বা বড় না হলে পূজা পাওয়ার যোগ্য কেউ হয় না। আর এ জন্যই আমরা বলি, আল্লাহু আকবর। বাংলাদেশে এমন কোন বাড়ি নেই যেখানে আগুনের ব্যবহার নেই। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আগুনের পূজা নয়, আগুনকে সেবকরূপে ব্যবহার করা

হচ্ছে। আগুনের ব্যবহার ভাল কাজেও হতে পারে, মন্দ কাজেও হতে পারে। পবিত্র কোরআন পাঠেও জানা যায় যে, এই আগুন যেমন ভাল কাজে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি মন্দ কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। ইব্রাহিম (আঃ)কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আবার মূসা (আঃ) আগুন দেখেই পাহাড়ে গিয়ে ওহী লাভ করেছিলেন। মূসা (আঃ) যে আগুনের দর্শন লাভ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে ছিল পবিত্র অগ্নি। বাইবেলে মহানবীর (সাঃ) শরিয়ত ব্যবস্থাকে অগ্নিময় ব্যবস্থা বলা হয়েছে! অতএব, অগ্নি মুশরেকদের কথা বলা মূর্খতা।

পাকিস্তানে হানাদার বাহিনী যখন এদেশের নিরস্ত্র মানুষের উপর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিল, নিরীহ মানুষের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল তখন এসব রাজনৈতিক আলেমরা টু-শব্দটিও করেননি বরং সমর্থন করে ফতোয়া দিয়েছিলেন। একাত্তরের আগুনের অপব্যবহার অগ্নিপূজার চাইতেও ছিল ভয়াবহ অপরাধ।

আমাদের দেশেও জন্ম বার্ষিকী পালন করতে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে কেক কাটা হয়। মৌলভী সাহেবরা এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন না। পীরের কবরে বাতি জ্বালিয়ে মানত করা হয়। মুর্দা পীরের কাছে ফুল দিয়ে, সিন্নি দিয়ে দোয়া করা হয়। লাল-নীল সূতা বাঁধা হয় বিশেষ উদ্দেশ্যে। 'জেহাদী' ওলামাদেরকে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করি, এসবের বিরুদ্ধে আপনারা বলেন না কেন? উরুস অনুষ্ঠানে পীরের মাজারে শির্ক হচ্ছে না? আপনারা আগে নিজেদের প্রজ্বলিত এসব বাতি নিভিয়ে ফেলুন, তার পর অন্য কথা বলুন। (১২-৪-৯৭ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সৌজন্যে)

মৌলবাদিদের বর্বরতা
আলজেরিয়ায় ৯৩ জনকে হত্যা

আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সের কাছে একটি গ্রামে ইসলামী মৌলবাদিদের হামলায় ৯৩ জন নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। নিহতদের মধ্যে বেশির ভাগই মহিলা ও শিশু। সাংবাদিকরা এ ঘটনাকে আলজেরিয়ার ৫ বছরের গৃহযুদ্ধের সবচে' বড়ো ধরনের একটি হত্যাকাণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন। এই হামলা চালানো হয় রাতের বেলায় আলজিয়ার্সের প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরের একটি গ্রামে। এই গ্রামটি সমতল ভূমিতে অবস্থিত এবং এখানে ইসলামী গোষ্ঠীগুলো বিশেষভাবে তৎপর। বিবিসি।

(২৩-৪-৯৭ইং তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

ঈদে তালিবান অভিযান

আফগানিস্তানের তালিবান জঙ্গিরা ঈদুল আযহার দিন রাজধানী কাবুলে অভিযান চালিয়ে মোট ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে ১৪জন মহিলা ও ১১ জন পুরুষ, যাদের ৭ জন ট্যাক্সি চালক।

মহিলাদের অপরাধ তারা বোরকা পরেনি। ৪ জন পুরুষের অপরাধ তাদের মুখে দাড়ি নেই কেন? আর ট্যাক্সি চালকের অপরাধ তারা বেপর্দা অর্থাৎ বোরকা না পরা মেয়েদের বহন করছিল। গ্রেপ্তারকৃতদের একজন জহির থাকেন পাকিস্তানে। পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে তিনি কাবুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্লিন শেভ করার অপরাধে তালিবান জঙ্গিরা তাকে ধরে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে পিটিয়েছে। এপি। (২২/৪/৯৭ইং তারিখের ভোরের কাগজের সৌজন্যে)

এম, টি, এ, ডাইজেস্ট

(১৬-৩১ মার্চ, ১৯৯৭)

সংকলন—আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

জুমআর খুৎবার বিষয়-বস্তু ঃ

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ধারাবাহিকভাবে পাপ থেকে মুক্তি লাভের সফর সম্পর্কে আলোকপাত করার পর বর্তমানে 'ইবাদুর রহমান' বা পরম করুণাময় (আল্লাহ)-এর বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত বাস্তব ও হৃদয়স্পর্শী আলোচনা করছেন। ২১ শে মার্চের খুৎবায় আল্লাহর বান্দা না হয়ে মানুষ কেন শয়তানের বান্দা হয় তার ব্যাখ্যায় সূরা ফাতেহার আলোকে বলেন যে, আল্লাহর মৌলিক গুণাবলী রহমান, রহীম, রাব্বুল আলামীন ও মালিকি ইওমিদ্দীন যখন অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে তখনই মানুষ তার ইবাদত করতে শুরু করে।

২৮শে মার্চ হুযূর (আইঃ) পাকিস্তানের শূরাকে সামনে রেখে বলেন যে, এখন থেকে যেহেতু প্রত্যেক শূরার উদ্দেশ্যে খুৎবা দেয়া যাবে না সেহেতু প্রতি বছর পাকিস্তানের শূরার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুৎবা সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নম্র ব্যবহার ও কোমলতার উপমা দিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন সকল আখলাকের উদ্দেশ্য আল্লাহ্ হওয়া আবশ্যক। যদি কর্মকর্তাগণ কোন আশা বা আকাঙ্খার কারণে নম্র ব্যবহার করেন বা মনে করেন হেকমতের বিচারে এরূপ দরকার তবে তা ভুল এবং ক্ষতিকর হবে। নম্র ব্যবহার স্বভাবজাত হতে হবে আর আশা, ভরসা, ভয় সবকিছুর কেন্দ্র খোদাতা'লা হতে হবে।

আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির আহমদীয়ত গ্রহণ ঃ

৩০শে মার্চ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে হুযূর (আইঃ) বুরকিনা ফাসোর জলসার উদ্দেশ্যে সরাসরি (live) বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত জলসায় রাজধানী উয়াগাডুগুর মেয়রের প্রতিনিধি, তিনজন সংসদ সদস্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দেশের বৃহত্তম গোত্র মসি এর রাজাধিরাজ (King of Kings) স্বয়ং আসতে চেয়েছিলেন। না পেরে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। একজন আহমদী মন্ত্রীও ব্যক্তিগতভাবে আসতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এছাড়া আফ্রিকার একটি মুসলিম গোত্রের প্রধান, যার আনুগত্যে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

হুযূর (আইঃ) জানান যে, পার্শ্ববর্তী গাম্বিয়া, সেনেগাল ও গিনি-বিসাউ-এ একত্রে এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার বয়াত হয়েছে। আর বুরকিনা ফাসোতেই এক লক্ষ সত্তর হাজারের উর্ধ্বে

বয়াত হয়ে গেছে। তবে এখনো ফরাসীভাষী দেশগুলোর মধ্যে সর্বাগ্রে আছে আইভরী কোষ্ট। সেখানে বয়াতের সংখ্যা আল্লাহ্‌র ফযলে দুই লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

কুরআন হতে বিশ্বজগতের আয়ু ঃ

১৭ই মার্চ প্রচারিত 'লেকা মা'আল আরব' অনুষ্ঠানে হুযূর (আইঃ) বলেন যে, কুরআনে একদিনের সমতুল্য পঞ্চাশ হাজার বছর বলা আছে। আবার একদিন সমান এক হাজার বছরও বলা হয়েছে। এভাবে প্রথমোক্ত এক দিনকে যদি বিশ্বজগতের আয়ু বলা হয় তবে তা আল্লাহ্‌র গণনায় ৫০ হাজার বছর যা আবার প্রতিটি দিন মানুষের গণনায় এক হাজার বছরের সমান। এভাবে বিশ্বজগতের আয়ু দাঁড়ায় ৫০,০০০ × ৩৬৫ × ১০০০ = ১,৮২৫ কোটি বছর। উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্বজগতের বর্তমান বয়স ১,৫০০ থেকে ২০০০ কোটি বছর।

বিবাহের নিমন্ত্রণে আপ্যায়ন সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা ঃ

২১শে মার্চের 'মুলাকাত' অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আইঃ) বিবাহের আপায়নের অনুমতি প্রদানের পটভূমি, যৌক্তিকতা ও শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন যে, তাহরীকে জাদীদের প্রাথমিক যুগে খরচ বাঁচিয়ে কুরবানী করার যে বিষয় ছিল তা এখন হারিয়ে যাচ্ছে। আর যারা বিয়ের সময় কঠোরভাবে কৃচ্ছতা প্রদর্শন করছেন তাদেরও বড় অংশের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাদা-সিদা জীবন যাপনের বদলে বিলাসিতা ও দুনিয়াদারীই পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই যখন কোন নিয়মের ক্ষেত্রে রূহ হারিয়ে যায় তখন যুগ-খলীফার দায়িত্ব যুগোপযোগী ফয়সালা প্রদান করা। বর্তমানে যে অনুমতি দেয়া হয়েছে তা এ শর্তে যে, খরচের শতকরা কুড়ি ভাগ গরীবের বিয়ের খরচ নির্বাহের জন্য দান করতে হবে। এটি ব্যক্তিগতভাবে বা জামাতের এ সংক্রান্ত তহবিলে জমা হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমন্ত্রিত অতিথিদের বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ [হুযূর (আইঃ) 'ভারী আক্‌সারিয়াত' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন] গরীবদের মধ্য থেকে হতে হবে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র ফযলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাহেব-যাদী তুবার বিয়েতে এ শর্তদ্বয়সহ আরো কিছু নির্দেশনা সুন্দরভাবে পালিত হয়।

বাংলাদেশে আহমদীয়তের ইতিহাসের উপর প্রামাণ্যচিত্র ঃ

বাংলা অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল একটি প্রামাণ্যচিত্র যেখানে এতদঞ্চলে আহমদীয়তের পথিকৃত মৌলানা সৈয়াদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন দেখানো হয়।

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল

(গুল)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

(শেষ কিস্তি)

ম্যাঁ আহমদী বাচ্চী হুঁ

(আমি আহমদী বালিকা)

ম্যাঁ আহমদী বাচ্চী হুঁ
হ্যায় 'আযম জাওয়াঁ জিস কা
ম্যাঁ বাত কী সাচ্চী হুঁ

ম্যাঁ আহমদী বাচ্চী হুঁ
উস কাওম কী বেটী হুঁ
ম্যাঁ কাওল কী পাক্কী হুঁ

বাকী হ্যায় যামানে মেঁ আব সিদ্‌ক ও সাফা মুঝ সে
হ্যায় হুসনে আদা মুঝ সে হ্যায় মোহর ও ওফা মুঝ সে

কুরআঁ মেরী দওলত হ্যায়
ইসলাম কী খাদেম হুঁ
আকওয়াল মেঁ শওকত হ্যায়

ঈমাঁ মেরী যিনাত হ্যায়
খেদমত মুঝে রাহাত হ্যায়
কিরদার মেঁ আযমত হ্যায়

আসমত কী আনা মুঝ সে 'ইফত কী বাকা মুঝ সে
সীখেঙ্গে জাহাঁওয়ালে আঈনে হায়া মুঝ সে

তাবিন্দা জাবিঁ মেরী
জো দুনিয়া পেরেশাঁ হ্যায়
এক তাযাহ্ ফালাক মেরা

হার বাত হাসীঁ মেরী
উওহ দুনিয়া নেহী মেরী
এক তাযাহ্ যমীঁ মেরী

ইস দস্তর কী যুলমাত মেঁ ফেলেগী যিয়া মুঝ সে
পাহনেগা জাহাঁ সারা কিরনোঁ কী কুবা মুঝ সে

ইয়াকসাঁ মেরী তানহাঈ আওর আঞ্জুমান আ রাঈ
বেকার তাকাল্লোফ কী বন্তী নেহীঁ সো দাঈ
ম্যাঁ ফায়েযে মসীহা সে করতী হুঁ মসীহাঈ

ইস দুনিয়া মেঁ আয়েগী জান্নাত কী হাওয়া মুঝ সে
রাযী হুঁ খোদা সে ম্যাঁ রাযী হ্যায় খোদা মুঝ সে

(আবদুল মান্নান নাহীদ প্রণীত)

অর্থ : আমি আহমদী বালিকা আমি আহমদী বালিকা
যাদের রয়েছে সতেজ সংকল্প আমি ঐ জাতির কন্যা
আমি কথায় সত্যবাদী কথায় আমি দৃঢ়

বর্তমান কালে আমা দ্বারা সততা ও পবিত্রতা প্রকাশ পাচ্ছে
আমার মাধ্যমে মনোরম ভঙ্গীমা প্রীতি ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ পাচ্ছে

কুরআন আমার সম্পদ ঈমান আমার সৌন্দর্য
ইসলামের সেবিকা আমি সেবাই আমার সুখ
কথায় আছে মহত্ব কার্যকলাপে শ্রেষ্ঠত্ব

সতীত্বের মূর্ত প্রতীক আমি পবিত্রতা আমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত
লজ্জার ভঙ্গীমা পৃথিবীবাসী আমার কাছ থেকে শিখবে

আমার ললাট সমুজ্জ্বল প্রত্যেক কথাই মোর সুন্দর
যে জগৎ অস্থিরতায় ভরা সে জগৎ আমার নয়
এক সতেজ গগন মোর এক সতেজ যমীন মোর

এ যুগের অন্ধকারে আমার মধ্য থেকে উজ্জ্বল আলো ছড়াবে
সারা জগৎ আমার নিকট থেকে জ্যোতির পোষাক পরবে

সমান সমান আমার একাকীত্ব ও আসর
অযথা লৌকিকতা করা এ পাগলামী মোর নেই
আমি মসীহার কল্যাণ থেকে ও আরোগ্য দান করি

আমার মাধ্যমে এ দুনিয়াতে আসবে বেহেশ্তের সমীরণ
আমি খোদার প্রতি সন্তুষ্ট খোদাও আমার প্রতি তুষ্ট

সময় দাও

সময় দাও **চিন্তার** তরে.....
শক্তির উৎস তো ইহাই।
সময় দাও **খেলার** তরে .....
সদা যৌবনের রহস্য তো ইহাই।
সময় দাও **পড়ার** তরে .....
জ্ঞানের প্রস্রবণ তো ইহাই।
সময় দাও **নামাযের** তরে .....
ধরার সবচে' শক্তি তো ইহাই।
সময় দাও **ভালবাসতে ও ভালবাসার** তরে .....
ঐশী-প্রদত্ত সুযোগ তো ইহাই।
সময় দাও **বন্ধুসুলভ** হওয়ার তরে .....
সুখের রাজপথ তো ইহাই।
সময় দাও **হাসবার** তরে .....
আত্মার ঝংকার তো ইহাই।
সময় দাও **দেবার** তরে .....
স্বার্থপর হওয়ার খুব ছোট্ট দিন তো ইহাই।
সময় দাও **কাজের** তরে .....
সফলতার মূল্য তো ইহাই।
সময় দাও **দান-খয়রাতের** তরে .....
জান্নাতের চাবিকাঠি তো ইহাই।

(কভার পৃষ্ঠাস্থ ইংরেজী কবিতার অনুবাদ)

সন্তান লাভ

০ গত ৩রা এপ্রিল, ৯৭ইং রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪-৩০ মিনিটে মহান আল্লাহ-তা'লা আমাদিগকে একটি পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

নবজাতক আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের মোয়াল্লেম জনাব ইসরাঈল দেওয়ানের ছেলের ঘরের নাতি ও মোয়াল্লেম মরহুম আব্দুল করীম সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতি। উক্ত নবজাতকের সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, নেককার জীবন লাভের জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। ইদ্রিস আহমদ দেওয়ান ও জাহেরা ইদ্রিস

০ মহান আল্লাহ পাক গত ৬ই এপ্রিল, ১৯৯৭ইং তারিখে আমাদেরকে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও সার্বিক কল্যাণের জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনের কাছে দোয়া প্রার্থী। গোলাম মোহাম্মাদ খান ও আমিনা বেগম

ওয়াকফে নও মোজাহিদগণের সাথে পরিচিত হোন

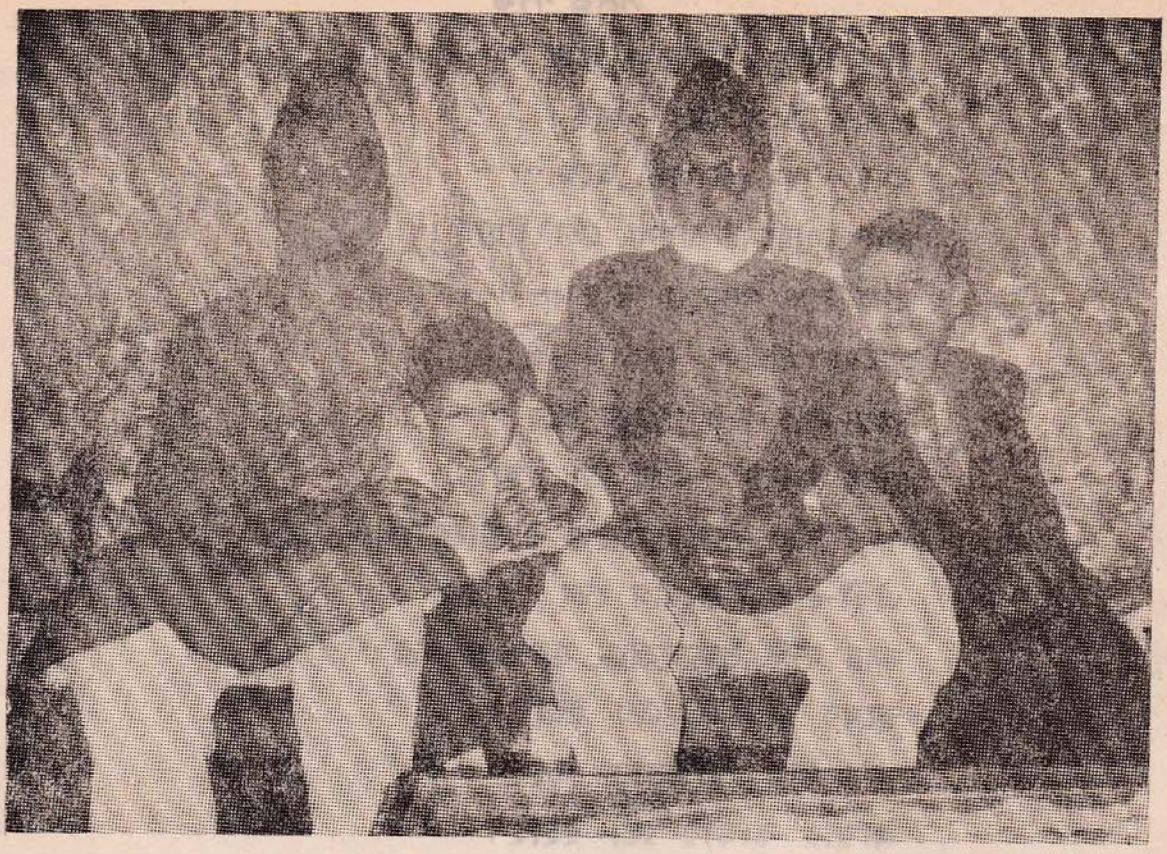

ওয়াকফে নও : (১) আহমদ তৌসিফ চৌধুরী
(২) আহমদ তৌফিদ চৌধুরী নম্বর—বি ১০৬৬
পিতা : আহমদ তবশির চৌধুরী পিতামহ : আহমদ তৌফিক চৌধুরী

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

তা অবশ্যই শয়তানের কাজ ছিল। তবে ঐ আগুনও শয়তান ছিল না। কেননা, আগুনের নিজস্ব কোন ইচ্ছা শক্তি নেই। শয়তান হল তারা যারা এই আগুনের অপব্যবহার করে ছিল। আগুন তো মানুষের সেবক। মালিক তাকে ভাল কাজেও ব্যবহার করে আবার মন্দ কাজেও ব্যবহার করে।

কোন কিছুর নাম চিরন্তন রাখলেই তা আল্লাহর শরীক হয়ে যায় না। আল্লাহর সৃষ্টি কখনও তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। জমিদারী প্রথাকে বলা হয়েছিল 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তো আর কিছু চিরস্থায়ী (কাইউম) নেই। অথচ ঐ বন্দোবস্তটির নাম দেয়া হয়েছিল 'চিরস্থায়ী।' কৈ তখন তো আপনারা চিৎকার করেন নি, ফতোয়া দেন নি ?

অহেতুক ফতোয়াবাজি করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি না করে আসুন, আমরা তাদের কাছে ইসলামের বাণী নিয়ে যাই যারা আল্লাহর পুত্র আছে বলে প্রচার করে, যারা স্রষ্টার কল্পিত মূর্তি তৈরী করে পূজা করে। প্রেম, প্রীতি ভালবাসা দিয়ে তাদেরকে তৌহীদের শিক্ষা বুঝিয়ে দেই। তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলি যে, সৃষ্টির পূজা নয় স্রষ্টার পূজা কর। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে আমাদের অধীনস্থ সৃষ্টিকে পূজা করে আমরা যেন মনুষ্যত্বের অপমান না করি। (এটিসি)

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের ১৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত :

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযল ও করমে গত ২৯ ও ৩০শে মার্চ '৯৭ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের ২ দিন ব্যাপী ১৬তম সালানা জলসা সুন্দরবন আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সম্পূর্ণ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

বহু হিন্দু ও গয়ের আহমদী এবং দেশের বিভিন্ন এলাকার জামাতের আহমদী সহ প্রায় ২০০০ জন অতিথি ২ দিন উপস্থিত ছিলেন।

o গত ১০-৩-৯৭ইং সোমবার খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিলের সামনে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাই মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে একটি বিশেষ খেদমতে খাল্ক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। হাল্কার যয়ীমদের দ্বারা সংগৃহীত পুরাতন বস্ত্র এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্র সংগৃহীত বস্ত্র ও কিছু নগদ অর্থ একত্রে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

o গত ২৭-২-৯৭ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ খুলনার ১০ম বার্ষিক ইজতেমা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়।

সন্তান লাভ

o গত ১৪ই মার্চ '৯৭ইং তারিখ শুক্রবার সকাল ৭-৪৫ ঘটিকার সময় মহান আল্লাহ্-তা'লা আমাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন (আলহামদুলিল্লাহ)। নবজাতক ও তার মাতার সুস্বাস্থ্যের জন্য এবং নবজাতকের দীর্ঘায়ু এবং খাদেমে দীন হওয়ার জন্য জামাতের প্রত্যেক ভাই-বোনের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি। মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
সেক্রেটারী ফাইনান্স, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা

শোক সংবাদ

o গত ২৮-৩-৯৭ইং রোজ শুক্রবার বিকাল তিনটার সময় ভাতগাঁও মসজিদ থেকে জুমুআর নামায পড়ে ভ্যানযোগে রামপুর হালকায় বাড়ী আসার পথে পিছন থেকে ট্রাকের ধাক্কায় দুর্ঘটনা হলে দিনাজপুর সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর খাকসারের প্রথম ছেলে মোহাম্মদ খুরশিদ আলম (বয়স ১৪) রাত ৯টার সময় ইন্তেকাল করে (ইন্না.....রাজেউন)। প্রতিবেশী আব্দুস সাত্তার মিয়ার ছেলে স্বপন রংপুর হাসপাতালে চিকীৎসাধীন আছে। উক্ত ভ্যানে ছেলেটিও ছিল। সে বর্তমানে সুস্থ আছে। খাকসারের ছেলের রূহের মাগফেরাত ও আমাদের ধৈর্য ধারণ এবং স্বপন নামক ছেলেটির সুস্থতার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, মোয়াল্লেম

o আমার একমাত্র ছেলে আব্দুর রহীম ওরফে বাদশাহ দীর্ঘ দিন হৃদরোগে আক্রান্ত অবস্থায় ৩৪ বৎসর বয়সে স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়ে রেখে আমার নিজ বাটিতে বিগত ১৯-৪-৯৭ তারিখে সকাল ৯ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেছে (ইন্না.....রাজেউন)।

জামাতের সর্বস্তরের ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট সকরুণ আবেদন এই যে, দোয়া করবেন করুণাময় আল্লাহ যেন মরহুমের রূহের মাগফেরাত ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামীল দান করেন। মুজাফফর আহমদ, প্রেসিডেন্ট হোসনাবাদ, আঃ মুঃ জাঃ

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবু রফীক

প্রশ্ন ঃ হুজরে আসওয়াদকে কিয়ামত কাল পর্যন্ত সংরক্ষণ করে, তাতে চুম্বন করে সম্মান প্রদর্শন করা কি শির্কের পর্যায়ে পড়ে না ?

উত্তর ঃ বর্তমান কাবা গৃহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নির্মাণ করেন। তিনি কাবা গৃহের এক কোণে এই কৃষ্ণ বর্ণের পাথরটি স্থাপন করেন। রসূল করীম (সাঃ) হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) স্মৃতি বিজড়িত এই প্রস্তরটিকে চুম্বন করেছিলেন। মহানবীর (সাঃ) এই চুম্বনের ফলেই মুসলমানরা মহানবীর (সাঃ) স্মৃতি বিজড়িত এই পাথরটিকে যুগ যুগ ধরে চুম্বন করে আসছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, "হে পাথর, আমি জানি তুই একটি পাথর মাত্র, ভাল মন্দ করার কোন ক্ষমতা তোর নেই। আমার প্রিয় নবীকে (সাঃ) চুম্বন করতে দেখেছি বলেই আমি তোকে চুম্বন করছি।" এথেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ঐ পাথরকে পূজা করা হয় না বরং প্রিয়জনের স্মৃতি হিসাবে চুম্বন করা হয়। পূজা তখনই হয় যখন মানুষ কোন বস্তুর কাছে কোন কিছু পাওয়ার আশা করে। আল্লাহ্ ছাড়া কোন সৃষ্ট জীব বা বস্তুর কাছে নত হয় বা ভাল মন্দের আশা করে। ভালবাসার কারণে প্রিয়জনের স্মৃতি বিজড়িত কোন বস্তুকে আদর যত্ন করা শির্ক নয়। আর এজন্যই হুজরে আসওয়াদের কাছে কেউ প্রার্থনা করে না, চাওয়া পাওয়ার জন্য প্রণত হয় না। অপর দিকে কুরআনের আয়াত লিখেও যদি কেউ তাবিজ ব্যবহার করে তাহলে তা হবে তৌহীদ বিরোধী (উমদাতুল বোখারী ১২ খণ্ড, ১০০ পৃঃ) নবী করীম (সাঃ) তাবিজ তুমারকে স্পষ্ট শির্ক বলেছেন (আহমদ, আবু দাউদ)। মানুষের ধারণা তাবিজ কবচ তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে, তার কল্যাণ সাধন করবে, আর এজন্যই তা শির্ক। কেননা একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন, কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। দেখুন, পাথর চুম্বন করলেও শির্ক হচ্ছে না আবার তাবিজ ধারণ করলেই শির্ক হয়ে যাচ্ছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, ইন্নামাল আমালু বিননিয়ত—অর্থাৎ নিয়ত অনুসারে কর্মের বিচার হয়ে থাকে। তাবিজ হিসাবে লাল, নীল সূতা ধারণ করলেও তা শির্ক হবে।

ইসলামে শুধু পাথরই নয়, আগুন, পানি সহ সকল সৃষ্ট পদার্থকে পূজা করা নিষেধ। সকল সৃষ্টিকেই মানুষের প্রয়োজনে আল্লাহ্‌তা'লা নিয়োজিত রেখেছেন। সকল সৃষ্ট পদার্থই

মানুষের গোলাম। অতএব প্রভু হয়ে গোলামের পূজা করার প্রশ্নই উঠে না।

প্রশ্ন : চিরকাল বা চিরন্তনকাল পর্যন্ত কোন বস্তুকে টিকিয়ে রাখা বা সংরক্ষণ করে রাখা কি শির্ক নয়? কারণ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তো আর কেউ চিরন্তন নয়?

উত্তর : আল্লাহ্তা'লা চিরন্তন বা চিরঞ্জীব। অন্য কিছু চিরন্তন নয়। যার আদি এবং অন্ত আছে তার নাম চিরন্তন রাখলেও তা চিরন্তন নয়। কারণ মানুষ যে বস্তুটিকে চিরন্তন আখ্যা দিল তার একটা সূচনা কাল আছে। কোন এক তারিখে বা দিনে যে বস্তুটি স্থাপিত হল তা অনাদি নয়। তাছাড়া কিয়ামতকালে যা শেষ হয়ে যাবে তা কখনও অনন্ত নয়। অতএব, চিরন্তন নাম দিলেই কোন কিছু আল্লাহ্র সমকক্ষ হয়ে যায় না। কারণ একমাত্র আল্লাহ্তা'লাই অনাদি, অনন্ত। অন্য সব কিছুরই আদিও আছে অন্তও আছে। কারো নাম অমর (যার মৃত্যু নেই) বা ইয়াহিয়া (জীবিত) রাখলেই সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ না করে চিরকাল জীবিত থাকবে একথা ঠিক নয়। এহেন নাম শির্কের পর্যায়ে পড়ে না। মানুষ যদি আগুন, পানি, মাটি, পাথর বা অন্য কোন বস্তুকে কোথাও স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত করে তার কাছে প্রার্থনা করে, মানত করে, মাথা নত করে বা প্রণাম করে তাহলে তা হবে শির্ক। মানুষ আল্লাহ্কে যেভাবে সেজদা করে এবং স্রষ্টার কাছে যেভাবে ভাল মন্দ প্রত্যাশা করে তেমনি যদি কেউ চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, পাথর বা অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর কাছেও প্রণত হয় বা কিছু চায় তাহলে অবশ্যই তা শির্ক হবে।

প্রশ্ন : প্রদীপ জ্বালিয়ে বা মশাল প্রজ্বলিত করে কোন অনুষ্ঠান করা কি ইসলামে নিষিদ্ধ?

উত্তর : প্রদীপ বা মশাল জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান করার কথা কুরআন হাদীসে নেই। এসব বিভিন্ন জাতি বা দেশের আচার অনুষ্ঠান। বিশেষ দিনে বা স্বাধীনতা দিবসে বাড়ী ঘরে আলোক সজ্জা করা হয় অর্থাৎ স্বাধীনতার স্মরণে বাতি জ্বালান হয়। জন্ম বার্ষিকী পালনে মোমবাতি জ্বালান হয় আবার ফু দিয়ে নিভান হয়। বিশেষ দিনে আতস বাজি পুড়ান হয়। এসব কর্মকে কেউ অগ্নি পূজা বলে না। পূজা তখনই হয় যখন আগুনকে সেজদা বা প্রণাম করে তার কাছে প্রার্থনা করা হয়। আগুন আমাদের সেবক। তাকে আমরা নানাভাবে ব্যবহার করে থাকি। তবে পীরের মাজারে মোমবাতি জ্বালিয়ে, দরগায় মানত করে কোন কিছুর জন্য দোয়া করা অবশ্যই শির্ক। শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) লিখেছেন, কবরে বাতি জ্বালাতে, কবরে সৌধ নির্মাণ করতে, কবরে হিন্দুদের ন্যায় মেলা বা ওরস করতে নবী করীম (সাঃ) নিষেধ করেছেন (বলাগুল মুবীন)।

প্রশ্ন : মৌলানা মৌলবী সাহেবরা বলেন যে, দোযখের আগুন নাকি কখনও নিভবে না, তাহলে কি দোযখের আগুনকে অনির্বাণ বলা যায়?

উত্তর : হাদীস পাঠে জানা যায় যে, এমন একদিন আসবে যখন দোযখের আগুনও নিভে যাবে। দোযখীরা তাদের শাস্তি ভোগ করে খালাস পেয়ে যাবে। অতএব, দোযখের আগুনও চিরন্তন বা অনির্বাণ নয়। দুনিয়ার সকল আগুনই কিয়ামত কাল পর্যন্ত। এই আগুন চির-

স্থায়ী নয়। যারা দোযখের আগুনকে অনাদি অনন্ত বলে তারাই শির্ক করে। একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই অনাদি ও অনন্ত নয়।

প্রশ্ন : মিলাদ মাহফিলেও বাতি জ্বালান হয় এবং বলা হয় যে, নবী করীম (সাঃ) ঐ মাহফিলে তশরীফ এনে থাকেন। এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর : মিলাদ একটি নব বিধান। প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান করতেন না। বড় বড় আলেমরা মিলাদ পড়েন না। মৌলানা আশরাফ আলী থানবী বলেন, মিলাদ অনুষ্ঠান শরীয়তে বিলকুল নাজায়েয, গুনাহ্র কাজ (বেহেশ্তী জেওর ও তরীকায়ে মৌলুদ)। নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক মিলাদ মহফিলে এসে হাজির হন, এ ধারণা তো সম্পূর্ণ কুফরী। অতএব, মিলাদ মহফিলে বাতি জ্বালানকে ইসলাম সমর্থন করে না।

প্রশ্ন : শিখা অনির্বাণ এবং শিখা চিরন্তন সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উত্তর : শিখা অনির্বাণ এবং শিখা চিরন্তন কোন ধর্মীয় বিষয় নয়। এই দু'টিকে পূজা করতে কেউ নির্দেশ দেয় নি। যারা স্থাপন করেছে তারাও এই শিখার কাছে কোন প্রার্থনা করে না। এই শিখাকে প্রভু জ্ঞান করে না। এই শিখা প্রজ্জ্বলনের একটি তারিখ আছে এবং এর অন্তও আছে। কিয়ামতের দিন যেদিন এই পৃথিবী গ্রহ ধ্বংস হয়ে যাবে সেদিন এই শিখাও নিভে যাবে। খোদা না করুন, বাংলাদেশ যদি স্বাধীনতা হারায় তাহলে স্বাধীনতার শত্রুরা এই শিখাও নিভিয়ে ফেলবে। স্বাধীনতা যতদিন থাকবে ততদিন এই শিখাও থাকবে বলে যে বিশ্বাস তা থেকেই এর জন্ম।

প্রশ্ন : এটা কি বিদেশী সংস্কৃতি নয় ?

উত্তর : এদেশের মানুষ বহু বিদেশী জিনিসকে দেশী বানিয়ে নিয়েছে। যেমন, পোষাক পরিচ্ছদ। প্যান্ট, সার্টকে, ব্লাউজ, পেটিকোটকে কেউ আর বিজাতীয় ভাবে না। সৈন্যরা যে সালাম দেয় তা ইসলামী পদ্ধতি নয়, তাদের পোষাকও ইসলামী নয়। কবুতর উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কি বিদেশী কায়দা নয় ? মিলাদুন্নবী পালনও অন্য জাতির রীতি। খৃষ্টান-দের অনুকরণে মহানবীর (সাঃ) জন্ম বার্ষিকী পালনের রীতি চালু করা হয় (মারেফুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ৩৮ পৃঃ, জাদুল মায়াদ, আরাফাত, ২৫ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা প্রভৃতি)। মৌলবী মৌলানা সাহেবরা যে তসবীহ বা জপমালা ব্যবহার করেন তা-ও মহানবীর আচরিত পদ্ধতি নয়। নবী করীম (সাঃ) কখনও তসবীহ ব্যবহার করেন নি। কুলখানী, চেহ্লাম, শবেবরাত এসব মূল ইসলামে নেই। বিজাতীয় রীতি থেকেই এসব মুসলিম সমাজে প্রবেশ লাভ করেছে।

সবশেষে বলি, যদি কেউ আগুনের পূজা প্রবর্তন করে তাহলে আমরা এর ঘোর বিরোধী। শুধু আগুন কেন, আমরা পীর পূজা, কবর পূজা, মূর্তি পূজা, শক্তি পূজা সহ সব রকমের গয়রুল্লাহ্র পূজাকে শির্ক মনে করি। আর যদি কেউ আগুনের পূজা না করে নানাভাবে আগুনের ব্যবহার করে কাজে লাগায় তাহলে সে ব্যাপারে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। যারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে মানুষ মারে, যারা আগুন দিয়ে অসহায় মানু-ষের ঘর বাড়ী জ্বালায় তারা অগ্নি পূজারীদের চাইতেও জঘন্য।

সম্পাদকীয়

মৌদুদী পন্থীদের নতুন ফতোয়া

দৈনিক সংগ্রামে 'সত্য অপ্রিয়' নামে একটি উপসম্পাদকীয় লিখেন জনৈক "সত্যবাদী।" মজার ব্যাপার এই 'সত্যবাদী' মহাশয় বহু মিথ্যার বেসাতি করে থাকেন এই কলামটিতে। কৃষ্ণকায় ব্যক্তির নাম যেমন লাল মিয়া অন্ধের নাম যেমন পদ্মলোচন রাখা হয় তেমনি এই 'সত্যবাদী' হলেন বহু মিথ্যার জনক। সম্প্রতি (১২/৪/৯৭) তিনি লিখেছেন, অগ্নি পারসিকদের উপাস্য, হিন্দুদের দেবতা আর মুসলমান ধর্মে অগ্নি হল শয়তান।

মুসলমান ধর্মে "আগুন শয়তান" এ কথার সমর্থনে ভদ্র লোক লিখেন যে, ইবলিস আগুন থেকে সৃষ্ট তাই আগুন হল শয়তান। ইবলিস ছিল জিন, আর জিন মাত্রই আগুন থেকে সৃষ্ট। অথচ জিন মাত্রই যে শয়তান নয় তা পবিত্র কুরআনে স্বীকৃত। জিনের মধ্যে যেমন শয়তান আছে তেমনি মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে। শয়তান একটি মাত্র শক্তির নাম যা জিন ইন্‌স উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে ফিরিশ্‌তা (সু) শক্তি ও শয়তান (কু) শক্তি আছে। মানুষ হিসাবে আমার মধ্যেও তা ছিল। আমার শয়তান শক্তিটি মুসলমান হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার বশ্যতা স্বীকার করে আমার নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে। পবিত্র কুরআন বলে, জীব মাত্রই পানি থেকে সৃষ্ট। তাই জিন যদি জীব হয়ে থাকে তাহলে জিনও পানি থেকে সৃষ্ট। বলা হয় মানুষকে আব (পানি) আতশ (আগুন) খাক (মাটি) বাত (বাতাস) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে তার প্রধান উপাদান মাটি। যেমন জিনের প্রধান উপাদান আগুন। অনেক ধর্মীয় পণ্ডিতের মতে মাটি ও আগুন জিন ও ইন্‌সের স্বভাবগত বা প্রকৃতিগত দিকটিকে বর্ণনার জন্য রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মতে, বহু জিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কারণ ইসলামের বিধান জিন ও ইন্‌সের জন্য নাযিল হয়েছে। যদি জিন মুসলমান হয়ে থাকে আর ঐ জিন আগুন থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তাকে শয়তান বলা যাবে কি? কখনও না। জিন ও ইন্‌স উভয় দলই নিজেদের কর্মানুযায়ী বেহেশ্‌ত এবং দোযখে যাবে। পবিত্র কুরআনে মানুষকেও শয়তান বলা হয়েছে। শয়তানের কোন নিজস্ব রূপ নেই, শয়তান কোন কোন সময় আপনার মত মানুষের রূপেও প্রকাশিত হয়। পবিত্র কুরআনের মতে জিন জাতির মধ্যেও নবীর আগমন হয়েছে। তাই লেখককে জিজ্ঞেস করি—জিন নবী যদি আগুন থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে সেই আগুনও কি আপনার মতে শয়তান?

মুসা (আঃ) পবিত্র তুয়া উপত্যকায় যে আগুন দর্শন করেছিলেন এবং তাথেকে হেদায়াত লাভ করতে গিয়েছিলেন (সূরা তাহা, ১০-১২ আয়াত)। আমরা মৌদুদী পন্থীদেরকে জিজ্ঞেস করি, ঐ আগুনও কি শয়তান ছিল? আপনারা ঘরে ঘরে যে আগুন দিয়ে রান্না করেন, আগুন দিয়ে বাতি জ্বালিয়ে যে কুরআন কিতাব পাঠ করেন তা-ও কি শয়তান? আপনারা কি দিনরাত এই শয়তানের সেবা গ্রহণ করছেন? শয়তান নিয়ে খেলছেন? তবে হ্যাঁ, একাত্তর সালে আপনারা নিরাপদ বাঙ্গালীদের ঘর বাড়ীতে যে আগুন লাগিয়ে ছিলেন

(অবশিষ্টাংশ ৪৮ পৃঃ দেখুন)

20th Issue 30th April, 1997
Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

দিবারাত্র প্রচাররত একমাত্র মুসলিম টেলিভিশন (MTA)

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করে চলেছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা এবং যুগ-খলীফার খুতবা সরাসরি প্রচার করে থাকে। ডিশের বর্তমান অবস্থান ৫৭° ডিগ্রী ইষ্ট (East) এবং ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সি ১০৯০ ও ৯৭৫-এর মধ্যে। অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ৬.৫০তে অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। বাংলায় অনুষ্ঠান শুনতে পারেন ৭.৩৮-৪০ বা ৪২ মেগাহার্টসে।

আপনিও খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় শীতকালে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা ৬.০০ মিনিটে শুনতে পারেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272